মাসিক

তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

জানুয়ারী ১৯৯৮
১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

প্রকাশকঃ

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী

ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ৭৬১৩৭৮

مجلة التحريك الشهرية ، مجلة علمية دينية

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها " حديث فاؤنديشن بنغلاديش"

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ বায়তুল মুকাররম মসজিদ,ঢাকা।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২

* বার্ষিক গ্রাহক চাঁদাঃ ১১০/০০
* ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদাঃ ৬০/০০

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০ টাকা
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০ টাকা
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০ টাকা
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০ টাকা
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০ টাকা
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০ টাকা

কারিগরি তথ্যঃ

* সাইজঃ ৯ ইঞ্চি-৭ ইঞ্চি
* ভাষাঃ বাংলা
* মুদ্রনঃ কম্পিউটার কম্পোজ
* পৃষ্ঠাঃ ৪৮
* প্রচ্ছদঃ এক রঙ অফসেট

০ স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (নূন্যপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

MONTHLY "AT-TAHREEK"
Edited by: Dr.Muhammad Asadullah Al- Ghalib
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription Tk: 110/00 Only.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SOPURA, RAJSHAHI.
Ph. (0721) 760525. Ph & Fax (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১ম বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা
রামাযান ১৪১৮ হিঃ
পৌষ ১৪০৪ সাল
জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং

সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে
মুদ্রিত।

সূচীপত্র

	পৃঃ
* সম্পাদকীয়	
* দরসে কুরআন	৩
* দরসে হাদীছ	৮
* প্রবন্ধ ঃ	
ছাদেকপুর, পাটনা -আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী	১১
আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহী বিরোধী ফায়সালা ও কুফুরীর মূলনীতি -আব্দুস সামাদ সালাফী	১৪
ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান	১৬
ছিয়াম সাধনাঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে -আব্দুল আউয়াল	১৮
*ছাহাবা চরিত্র হযরত আলী -আখতারুল আমান	২১
* গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান -আব্দুস সামাদ সালাফী	২৮
* কবিতা	
যালেমের যুলুম -সংকলনেঃ শিহাবুদ্দীন সুন্নী	২৯
তাহরীকের প্রতি -এস এম, আমজাদ হোসেন	২৯
এখন রামাযান তবুও! -মুহাম্মাদ আবু আহসান	২৯
আত-তাহরীক -মাকছুদ আলী মুহাম্মাদী	৩০
বাঁকা চাঁদ -ইমামুদ্দীন	৩০
* মহিলাদের পাতা	৩১
* সোনামণিদের পাতা	৩৩
* স্বদেশ-বিদেশ	৩৫
* মুসলিম জাহান	৪০
* বিজ্ঞান ও বিস্ময়	৪১
* প্রশ্নোত্তর	৪২

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পাদকীয়

খোশ আমদেদ মাহে রামাযান

বর্ষ পরিক্রমায় অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমাদের দুয়ারে নেকী ও ছওয়াবের ডালি নিয়ে আল্লাহভীতির বিশেষ গুণ অর্জনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও সংযমশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে যে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটে, সেই আত্মশুদ্ধি ও আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনের জন্যই রামাযানের আগমন। ঈমান ও তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে মানবতার পূর্ণ বিকাশ সাধন রামাযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সকল অন্যায় ও পংকিলতা হ'তে মুক্ত হয়ে মুমিনকে নিষ্পাপ শিশুর মত পবিত্র করার জন্যই রামাযানের আগমন। অতএব তোমার আগমন শুভ হৌক হে মাহে রামাযান!

মানুষের জীবনের দু'টি ভাগ আছে একটি আধ্যাত্মিক ও অন্যটি বৈষয়িক। বৈষয়িক জীবন পরিচালিত হয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপরে ভিত্তি করে। যখন কোন জাতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে ধ্বস নামে, তখন সে জাতির বৈষয়িক উন্নতি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। বিধ্বস্ত বিগত সভ্যতাগুলি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ইসলামের সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য থাকে তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। ছিয়ামে রামাযান একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি ফরয ইবাদত। অতএব ছিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহ'লে ছিয়াম কেবল উপবাসের নাম হবে, অন্য কিছু হবে না।

এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, রামাযান কালেই আল্লাহ পাক তাঁর সেরা আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন। বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআনও এমাসের কদর রজনীতে নাযিল হয়েছে। যার ফলে কদর রজনীর ইবাদত হাযার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। কুরআন নাযিল হওয়ার সম্মানে এবং আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে রামাযানে সকল নেকীর কাজের ছওয়াব আল্লাহ নিজে দিবেন। আল্লাহ্র ঐ মহা নেয়ামত আল-কুরআন ও আল-হাদীছ মুসলমানদের কাছে আমানত রয়েছে। জীবন পরিচালনার জন্য অন্য কারু হেদায়াত প্রয়োজন নেই। নুযূলে কুরআনের মাস হিসাবে রামাযানের যে সম্মান, কুরআন তথা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র ধারক ও বাহক হিসাবে মুসলমানেরও সেই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে সকল উম্মতের মধ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা কি কুরআন-হাদীছকে সেই মর্যাদা ও সম্মান দিতে পেরেছি?

অতএব আসুন! রামাযানকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যেন একে সত্যিকারভাবে সম্মান দিতে পারি। যাবতীয় পাপ ও অন্যায় থেকে তওবা করে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সক্ষম হই এবং পরিশেষে নির্মল আত্মশক্তি অর্জনের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিচ্ছন্ন করতে পারি। মাহে রামাযান, লায়লাতুল কদর ও ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে আমরা আমাদের সকল গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পাঠক-পাঠিকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এই পবিত্র মাসের রহমত ও বরকত অর্জনে তাওফীক দান করেন। আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

উন্নত মানুষ হও

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- (سورة البقرة ١٨٣-١٨٥)

১। অনুবাদঃ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপরে ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। যাতে তোমরা সংযমশীল হ'তে পার'। গণিত কয়েকটি দিন মাত্র। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত বা মুসাফির থাকে, তবে সে যেন অন্য মাসে এগুলি গণনা করে (অর্থাৎ ক্বাযা আদায় করে)। আর যদি কারো জন্য ছিয়াম সাধ্যাতীত হয়, তবে সে যেন বিনিময়ে দৈনিক একজন করে মিসকীনকে 'ফিদ্ইয়া' হিসাবে খাদ্য দান করে। খুশী মনে অধিক নেকী করলে সেটা তার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে। আর যদি ছিয়াম পালন কর, তবে সেটাই তোমাদের জন্য বিশেষ মঙ্গলজনক হবে, যদি তোমরা বুঝ'(১৮৪)। রামাযান সেই মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে 'কুরআন'। যা মানুষের হেদায়াত ও হেদায়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য কারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে, সে যেন এই মাসে ছিয়াম পালন করে। তবে যে ব্যক্তি পীড়িত ও মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে যেন অন্য মাসে এগুলি গণনা করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কাঠিন্য চান না। যাতে তোমরা (এক মাসের) গণনা পূর্ণ করতে পার এবং তোমাদেরকে হেদায়াত দানের কারণে তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর'(১৮৫)।

২। **শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ** كُتِبَ عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপরে 'ফরয' বা অপরিহার্য করা হ'ল। كُتِبَ অর্থ 'লিখিত হ'ল' বা 'চূড়ান্তভাবে মোহরাংকিত হ'ল'। কুরআনে বহু স্থানে 'ফরয' করা অর্থে 'কুতিবা' ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। 'ছিয়াম' ও 'ছওম' দু'টিই 'মাছদার' বা ক্রিয়ামূল। আভিধানিক অর্থ-বিরত থাকা-(صَامَ صَوْمًا وصِيَامًا اى أَمْسَكَ- المعجم الوسيط) শারঈ অর্থে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা, যৌনাচার ও যাবতীয় শরীয়ত নিষিদ্ধ বস্তু হ'তে বিরত থাকাকে 'ছিয়াম' বলা হয় (কুরতুবী)।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -'যাতে তোমরা আল্লাহ্ভীরু বা সংযমশীল হ'তে পার'। এখানে لَعَلَّ অর্থ لام كى অর্থাৎ لِتَتَّقُوْا। (কুরতুবী) 'যাতে তোমরা তাক্বওয়া হাছিল করতে পার'।

অর্থাৎ ছিয়াম পালন করলে যে তোমরা অবশ্যই মুত্তাক্বী হবে, তা নয়। বরং মুত্তাক্বী হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। تَقْوَى (তাক্বওয়া) মূলে ছিল وَقْوَي (ওয়াক্বওয়া), ওয়াও -কে 'তা' দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন تُقَاةٌ (তুক্বাতুন) মূলে ছিল وُقَاةٌ (ওক্বাতুন) تُرَاثٌ (তুরাছুন) মূলে ছিল وُرَاثٌ (ওরাছুন)। তাক্বওয়া অর্থ- ভয়। যেমন رَجُلٌ تَقِيٌّ অর্থ- ভীরু ব্যক্তি।[১] এক্ষণে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -এর অর্থ হবে 'যাতে তোমরা আল্লাহ্ভীরু হ'তে পার'। আল্লাহভীরু হ'লেই মানুষ সত্যিকারভাবে অন্যায় থেকে বিরত হয় ও সংযমী হয়। এখানে تقوى অর্থ 'পর্দা'ও হ'তে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মান্য করা তোমাদের জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার পর্দা হবে। মূলতঃ এ অর্থেই হাদীছে ছিয়ামকে جُنَّةٌ বা 'ঢাল' বলা হয়েছে।[২] মূলতঃ শরীয়তে অপসন্দনীয় বস্তু হ'তে বেঁচে থাকাকেই (أصل التقوي التوقي مما يكره) 'তাক্বওয়া' বলা হয়।[৩] আর সেই অর্থেই ফারসীতে মুত্তাক্বী অর্থ করা হয় 'পরহেযগার' ও বাংলাতে করা হয় 'সংযমশীল'। আর এই গুণটি সত্যিকার অর্থে মানুষ তখনই অর্জন করতে পারবে যখন সে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় করবে।

১.কুরতুবী ১/১৬২ পৃঃ।
২.কুরতুবী ১/২২৭।
৩.ইবনু কাছীর ১/৪২।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ্ভীরুতা হ'ল আভ্যন্তরীণ গুণ এবং সংযমশীলতা হ'ল তার বাহ্যিক গুণ। দু'টির ক্ষেত্র পৃথক হ'লেও ফলাফল একই। সকল আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সংযমশীল কিন্তু সকল সংযমশীল ব্যক্তি আল্লাহভীরু না-ও হ'তে পারেন। আল্লাহভীরুতার খবর আল্লাহ ভাল জানেন। বান্দা দেখবে মুমিনের বাহ্যিক সংযমশীলতা। যে গুণটি হাছিল না হ'লে কল্যাণময় পরিবার ও সমাজ গঠন কোনভাবেই সম্ভব নয়। মূলতঃ সে উদ্দেশ্যেই ইসলামে ছিয়াম ফরয করা হয়েছে।

رَمَضَانُ (রামাযান)ঃ আরবী ৯ম মাসের নাম عَلَم ও الف। ونون زائدتان , غير منصرف হওয়ার কারণে শব্দটি যা শেষে কখনও 'তানভীন' কবুল করেনা। মূল শব্দ হ'ল رَمَضَ (রামায)। رَمِضَ رَمَضًا ، رَمِضَتِ الأرْضُ যমীন সূর্যতাপে পুড়ে গেছে رَمِضَتْ قَدَمُه 'তার পা গরমে পুড়ে গেছে' رَمِضَ الصَّائِمُ 'ছায়েমের পেট ক্ষুৎ-পিপাসায় জ্বলে গেছে'। অতএব অধিক জ্বলে পুড়ে খাক হওয়াকে رَمَضَانُ (রামাযান) বলা হয়। একটানা একমাস ধরে ছিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈব প্রবৃত্তিকে ক্ষুৎ-পিপাসার আগুনে জ্বালিয়ে দুর্বল করে ফেলা হয় বলে, এ মাসটিকে 'রামাযান' মাস বলা হয়েছে।

قُرْآن অর্থ পাঠ করা। যা 'মাছদার' কিন্তু কর্মকারকে مَقْرُوْءٌ বা 'পঠিত' অর্থে ব্যবহৃত হয়। (قَرَأَ قِرَاءَةً و قُرْآنًا) হাফেয, ক্বারী ও মুমিনদের ছালাতের মাধ্যেমে সর্বদা পঠিত হয় বলে আল্লাহ প্রেরিত এই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কেতাবকে 'কুরআন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 'যখন আমরা পাঠ করব, তখন আপনি (জিব্রীলের) পাঠের অনুসরণ করুন' (ক্বিয়ামাহ ১৮)। অন্যত্র বলা হয়েছে- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'নিশ্চয়ই ফজরের কিরাআত (রাতের বিদায়ী ও দিবসের আগত উভয় ফেরেশতা দলের দ্বারা) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়' (বানী ইস্রাঈল ৭৮, বুখারী, ইবনু কাছীর ৩/৫৮)।

هُدًى অর্থ 'পথপ্রদর্শক' هُدًى মূলতঃ মাছদার বা ক্রিয়ামূল (هَدَي هُدًي وهَدْيًا وهِدَايَةً) কিন্তু اسم فاعل বা কর্তৃকারক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেকারণ 'পথপ্রদর্শক' অর্থ করা হয়েছে। 'হেদায়াত' দুই অর্থে আসতে পারে। একটি হ'ল هُدًى دلالة و إرشاد অর্থাৎ রাস্তা দেখানো, দাওয়াত দেওয়া, সর্তক করা ইত্যাদি। এ কাজ নবী রসূল ও তাঁদের অনুসারীদের। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 'নিশ্চয়ই আপনি ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র এবং প্রত্যেক কওমের জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে' (রা'দ ৭)। দ্বিতীয় অর্থ হ'ল هُدًى تائيد و توفيق অর্থাৎ হৃদয়ে হেদায়াতের আকাংখা ও তাকীদ সৃষ্টি করা। এটি স্রেফ আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। শেষ নবী (ছাঃ)-এর হাযার চেষ্টাতেও তাঁর প্রধান দুনিয়াবী সহযোগী চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাওফীক পাননি। এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ 'নিশ্চয়ই আপনি পথ প্রদর্শন করতে পারেন না ঐ ব্যক্তিকে যাকে আপনি প্রিয় মনে করেন। বরং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন এবং তিনিই হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' (ক্বাছাছ ৫৬)। বর্তমান আয়াতে প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

اَلْفُرْقَان অর্থ 'বুরহান' বা দলীল-প্রমাণ। যার দ্বারা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয় (كل ما فُرِقَ به بين الحق والباطل)। فُرْقَانٌ মূলতঃ فَرَقَ ক্রিয়ার 'মাছদার' বা ক্রিয়ামূল। فَرَقَ فَرْقًا فُرْقَانًا যার অর্থ দু'টি বস্তুর মধ্যে পৃথক করা। বলা হয়ে থাকে فَرَقَ بين الشيئين اى فصل و ميّز احدهما من الآخر। এখানে 'আল-ফুরক্বান' বলতে 'কুরআন' বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃত অর্থেই হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।

যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا 'বরকতময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দার উপরে ফুরক্বান (কুরআন) নাযিল করেছেন। যাতে ঐ বান্দা (মুহাম্মাদ) বিশ্ববাসীর জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হ'তে পারে'(ফুরক্বান ১)।

৩। ফাযায়েলঃ (ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ছওয়াবের আশায় রামাযানে এবং লায়লাতুল ক্বদরে ছালাতের মধ্যে রাত্রি জাগরণ করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[৪]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের

৪.বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হাদীছ সংখ্যা ১৯৮৫)

প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই রাখা হয় এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সঙ্গে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশ্কের খোশ্বুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে তখন মন্দ কথা বলবে না ও শোরগোল করবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে, তখন বলবে আমি ছায়েম।[৫]

৪. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই প্রতি মাসে তিনদিন করে ছিয়াম পালনের বিধান চলে আসছিল। ইসলামের প্রথম দিকে এবং আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পরেও মাসে তিনদিন ও একদিন আশুরার ছিয়াম পালনের নিয়ম ছিল। অতঃপর ২য় হিজরীতে পূর্ণ রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয় এবং বাকী সকল ছিয়াম নফলে পরিণত হয়। ইচ্ছা করলে কেউ রাখতেও পারে, ছাড়তেও পারে (ইবুন কাছীর)। 'পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের উপরে ফরয করা হয়েছিল' -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শা'বী, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বলেন যে, আল্লাহ মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর কওমের উপরেও রামাযানের এক মাস ছিয়াম ফরয করেছিলেন। কিন্তু তাদের আলেমগণ (আহবারগণ) আরও ১০দিন বাড়িয়ে নেন। পরে জনৈক আলেম রোগাক্রান্ত হ'লে তিনি মানত করেন যে, সুস্থ হ'লে আরও ১০ দিন বৃদ্ধি করবেন। এইভাবে তাদের ৫০ দিন ছিয়াম-এর নিয়ম চালু হয়ে যায়। এতে যখন লোকেরা খুবই কষ্টবোধ করে, তখন রামাযান বাদ দিয়ে তারা বসন্তকালে (ربيع) ছিয়াম পালনের বিধান চালু করে'। এই মতের সমর্থনে দাগফাল বিন হানযালা (রাঃ) হ'তে একটি মরফূ হাদীছ বুখারী স্বীয় তারীখে ও তাবারাণী বর্ণনা করেছেন (কুরতুবী, ফাৎহুল ক্বাদীর)।

১৮৩ আয়াতের শেষে ছিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে- 'যাতে তোমরা আল্লাহভীরু বা সংযমশীল হ'তে পার'। জৈবিক তাড়নার বশীভূত হ'য়ে মানুষ যখন বিবেক হারিয়ে ফেলে, তখনই সে পশুতে পরিণত হয়। একটানা একমাস নিয়মিত ছিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈবিক তাড়না দুর্বল হয়। বিবেক শানিত হয়। রিপু দমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় আধ্যাত্মিক সাধনার নামে মানুষের জৈবিক চাহিদাকে ধ্বংসের চেষ্টা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং ষড় রিপুকে বিবেকের বশীভূত করে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই ইসলামের কাম্য। মানুষ যেন প্রবৃত্তির দাসত্ব করে লাগামহীন অমানুষে পরিণত না হয়, সেজন্যই তার উপরে ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যাতে সে আল্লাহভীরু ও সংযমশীল হয়। একদা ওমর ফারূক (রাঃ) মসজিদে নববীর ইমাম খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত উবাই বিন কা'আব (রাঃ)-কে তাক্বওয়ার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আপনি কি কখনো কাঁটা বিছানো রাস্তা দিয়ে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বল্লেন, হাঁ। উবাই বল্লেন, তখন কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বল্লেন, কাপড় উঠিয়ে অতি সাবধানে চলেছি (যাতে কাঁটা না বিঁধে)। উবাই বিন কা'আব(রাঃ) বল্লেন, فذلك التقوى ওটাই তো 'তাক্বওয়া'।[৬] অতএব ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন সকল প্রকারের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখাই মুমিনের প্রধান কর্তব্য। ছোট গোনাহকে ছোট মনে করে অবহেলা করা উচিত নয়। কেননা বিন্দু বিন্দু পানি দিয়েই 'সিন্ধু' তৈরী হয়। ছোট্ট বালুকণা দিয়েই মরুভূমি গঠিত হয়। তাছাড়া একটি ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়। হযরত ওমর ও ইবুন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে

لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة من إصرار

'তওবা-ইস্তেগফার করলে কবীরা গোনাহ থাকে না এবং বারবার করলে তা আর ছগীরা থাকে না।[৭] হাশরের ময়দানে নিজ নিজ আমলনামা দেখে আমরা গোনাহগারগণ বলে উঠব وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا 'হায় হায় এ কেমন আমল নামা যে আমাদের ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি! সবকিছুই সেদিন তারা প্রত্যক্ষ দেখবে। আর তোমার প্রভু কারো উপরে যুলম করেন না' (কাহাফ ৪৯)। উল্লেখ্য যে, আধ্যাত্মিক সাধনার নামে মানুষের ষড়রিপু বা প্রবৃত্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করা যেমন মহাপাপ, প্রবৃত্তিগুলির গোলামী করাও তেমনি মহাপাপ। বরং ওগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই মানবতার প্রকৃত বিকাশ লাভ সম্ভব। ছিয়াম মূলতঃ সে উদ্দেশ্যেই ফরয করা হয়েছে।

(খ) ১৮৪ আয়াতঃ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ.....إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ এ আয়াতে দুই শ্রেণীর মুমিনকে ছিয়ামের অপরিহার্যতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় এক শ্রেণীর মুমিনকে বার্ধক্যজনিত অপরাগতায় 'ফিদ্ইয়া'

৫.বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-হা/১৯৫৯।

৬.ইবনু কাছীর ১/৪২।

৭.মুসলিম, নববী 'ঈমান' অধ্যায় ১/৬৫ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

দিতে বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী হ'ল রোগী ও মুসাফির। যে রোগীর ছিয়াম পালনের শক্তি নেই অথবা ছিয়ামের ফলে যে রোগীর রোগ বৃদ্ধির আশংকা আছে, ঐ উভয় প্রকার রোগী অন্য মাসে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। অতঃপর মুসাফির বলতে প্রচলিত অর্থে যাকে মুসাফির বলা হয়, তাকেই বুঝায়।[৮]

এখানে সফর বলতে নেকী ও কল্যাণের সফর বুঝতে হবে, অন্যায় ও গোনাহের সফর নয়।[৯] এটা মুসাফির মুমিনের জন্য আল্লাহ্র বিশেষ রহমত। তবে শক্তিতে কুলালে মুসাফিরের জন্য ছিয়াম পালনের এখতিয়ার রয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন যে, আমরা আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর সাথে রামাযান মাসে একত্রে সফর করেছি। আমাদের মধ্যে কেউ ছিয়াম রাখত কেউ রাখ্ত না। কিন্তু কেউ কাউকে দোষারোপ করত না।[১০] অবশ্য বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতের শেষাংশের আলোকে ইমাম আহমাদ, ইসহাক, আওযাঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ সফরে ছিয়াম পালন না করাকেই উত্তম বলেছেন (কুরতুবী)। অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল দেখে ইমাম শাফেঈ সফরে ছিয়াম পালন করাকে উত্তম বলেছেন (ইবনু কাছীর)।

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه সুদ্দী বলেন, এর অর্থ হ'ল يتجشمونه যারা ছিয়ামকে খুব ভারী ও কষ্ট দায়ক মনে করবে' (ইবনু কাছীর)। باب إفعال -এর অন্যতম خاصه বা বিশেষত্ব হ'ল سَلْب যার অর্থ দূরীকরণ। যেমন أَقْذَيْتُ عَيْنَهُ 'আমি তার চোখ হ'তে ধূলিকণা অপসারণ করেছি'। উক্ত خاصه অনুযায়ী يُطِيْقُوْنَهُ অর্থ হ'বে طاقة বা শক্তি দূর হ'য়ে যাওয়া। এক্ষণে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে 'ছিয়াম যাদের জন্য অতীব কষ্টসাধ্য বা সাধ্যাতীত হবে'। তারা প্রতি ছিয়ামের জন্য একজন করে মিসকীন খাওয়াবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সামর্থে কুলালে একাধিক মিসকীন খাওয়াবে (কুরতুবী)। অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্যই এ বিধান রাখা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হয়ে গেলে রামাযান মাসে স্বীয় ছিয়ামের দিনে মিসকীন খাওয়াতেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি একদিনে ৩০ জন মিসকীনকে দাওয়াত দিয়ে উত্তম খানা 'ছাবীদ' (লাউ ও গোস্তের সুরুয়াতে ভিজানো রুটি) খাইয়ে দেন (ইবনু কাছীর)।

৮.মুহাল্লা ৫/২১ পৃঃ; রাসূল কি নামায ১১৯ পৃঃ।

৯.কুরতুবী২/২৭৭ পৃঃ।

১০.মুয়াত্তা মালেক, বুখারী, মুসলিম -কুরতুবী ২/২৮০।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতের মাধ্যমে শক্তিহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মায়েদেরকে রুখছত দেওয়া হয়েছে- যদি তারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও বাচ্চাদের জন্য (দুধ কমে যাওয়ার ব্যাপারে) ভীত হন। তারা কেবল ফিদ্ইয়া দিবেন, ক্বাযা আদায় করতে হবে না।[১১] অবশ্য স্বাস্থ্যহীন, অর্থহীন বাধ্যগত মিসকীন-এর জন্য কোন শারঈ চাপ নেই। তবে সাধ্যপক্ষে ছিয়াম পালন করাই উত্তম, সেকথা আয়াতের শেষে বলে দেওয়া হয়েছে।

(গ) ১৮৫ নং আয়াতঃ নুযূলে কুরআন -এর মাস

সর্বশেষ আসমানী কেতাব আল-কুরআনুল করীম 'লওহে মাহফুয' থেকে একত্রে সর্বপ্রথম নাযিল হয় ২৪ রামাযানে লায়লাতুল ক্বদরে দুনিয়ার আসমানে 'বায়তুল ইয্যতে' বা 'বায়তুল মা'মূরে'। অতঃপর সেখান থেকে ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে নবীর উপরে নাযিল হয়। কুরআন বছরের বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। কিন্তু অত্র আয়াতে শুধুমাত্র রামাযান মাসের কথা উল্লেখ থাকায় আতিয়া বিনুল আসওয়াদ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি উপরোক্ত জওয়াব দেন' (ইবনু কাছীর), ইবনু জারীর, তাবারাণী, বায়হাকী, হাকেম -একে ছহীহ বলেছেন।[১২] সূরায়ে ক্বদরে আল্লাহ বলেন, 'আমরা উহাকে ক্বদর রজনীতে নাযিল করেছি'(ক্বদর ১)।

শুধু কুরআন নয় বরং সকল আসমানী কেতাবই রামাযান মাসে নাযিল হয়েছে। এ মর্মে ইমাম আহমাদ হযরত ওয়াছেলাহ বিন আসক্বা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর 'ছহীফা' সমূহ রামাযানের ১ম রাত্রিতে, 'তওরাত' ৬ষ্ঠ রাত্রিতে, 'ইনজীল' ১৩শ রজনীতে এবং 'কুরআন' ২৪শ রজনীতে নাযিল হয়'। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, 'যবূর' নাযিল হয়েছে ১২শ রজনীতে, ইন্জীল ১৮শ রজনীতে।[১৩] অতঃপর হেরা গুহাতে কুরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবারে।[১৪] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেন ও সোমবারে মৃত্যুবরণ করেন এবং সোমবারেই প্রথম নবুঅত প্রাপ্ত হন।[১৫]

১১.আবু দাঊদ, সনদ ছহীহ, কুরতুবী ২/২৮৮।

১২.ফাৎহুল ক্বাদীর১/১৮৪।

১৩.ইবনু কাছীর ১/২২১-২২; কুরতুবী ১/৬০; ২/২৯৭।

১৪.মনছূরপুরী, রাহ্মাতুললিল আলামীন ১/৪৭ পৃঃ।

১৫.মুসলিম, মিশকাত 'নফল ছিয়াম' অধ্যায় হা/ ২০৪৫; বুখারী 'মারযুন নবী' অধ্যায় ২/৬৪০ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম ৪৬৯ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

অত্র আয়াতে কুরআনের তিনটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি هُدًى (হুদা) অর্থ 'পথপ্রদর্শক'। ২য়টি بينات من الهدى 'হেদায়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা' এবং ৩য় টি فرقان 'হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী'। ১ম বিশেষণে 'মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক' বলার ফলে কুরআনের বিশ্বজনীনতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন বিশ্বমানবের জন্য পথপ্রদর্শক। চাই সে যেকোন দেশ, বর্ণ বা গোত্রের হোক না কেন। কিন্তু সূরায়ে বাক্বারাহ্র ৩য় আয়াতে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাক্বীদের জন্য পথপ্রদর্শক' বলার উদ্দেশ্য হ'ল মুত্তাক্বীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। কেননা কুরআন নিঃসন্দেহে বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক হ'লেও তাকে গ্রহণ ও বরণ করে নিয়েছে কেবলমাত্র মুমিন-মুত্তাক্বী লোকেরা। অতএব কুরআনের দ্বারা কেবল মুত্তাক্বীরাই কল্যাণ লাভ করবে, ফাসেক-কাফেররা নয়। যেমন ঔষধ তৈরী করা হয় দল-মত নির্বিশেষে সকল রোগীর জন্য। কিন্তু তার দ্বারা উপকৃত হয় কেবল ঐ রোগী যিনি ঔষধ সেবন করেন ও চিকিৎসকের নিয়ম-বিধি মেনে চলেন। অমনিভাবে কুরআনী ঔষধ যারা সেবন করবেন ও নবীর দেওয়া নিয়মবিধি তথা সুন্নাতের যারা পাবন্দী করবেন, কেবলমাত্র সেইসব মুত্তাক্বীদের জন্যই কুরআন হ'ল অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক।

২য় বিশেষণ দ্বারা কুরআনের 'মুহকাম' আয়াত সমূহ এবং হাদীছের মাধ্যমে প্রেরিত স্পষ্ট বিধান সমূহ বুঝানো হয়েছে। যেখানে হালাল-হারাম উপদেশ ও বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্য আয়াতে কুরআনকে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ 'সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ' (নাহল ৮৯) বলা হয়েছে। হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إنى أوتيت القرآن و مثله معه 'আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে অনুরূপ আরেকটি' (আবু দাঊদ)। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى 'রসূল নিজ ইচ্ছামত কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তার উপরে অহি প্রেরিত হয়' (নাজম ৩-৪)।

এ সবের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও হাদীছ দু'টিই আল্লাহ্র অহি এবং এ দুই অহি-র সমষ্টিই হ'ল 'হেদায়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা'। যেমন কুরআনে ছালাত ও যাকাতের হুকুম এসেছে। কিন্তু হাদীছে সেগুলির নিয়ম-বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা এসেছে।

৩য় বিশেষণটি হ'ল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কুরআনকে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন তথা আল্লাহ্র অহি অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত মানদন্ড। উক্ত মানদন্ডেই সবকিছু বিচার করতে হবে। নবীগণ ব্যতীত কোন মানুষই অভ্রান্ত নয়। তাই নিঃশর্তভাবে কোন একজন মানুষের সকল কথা গ্রহণীয় বা সকল কথা বর্জনীয় নয়। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির কোন রায় বা সিদ্ধান্ত তখনই মেনে নেওয়া যাবে, যখন তা অহি-র মানদন্ডে সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। কেননা মানুষের রায় আল্লাহ্র অহিকে বাতিল করতে পারে না। সেই মানুষ কোন পন্ডিত হোক, বিজ্ঞানী হোক, রাজনীতিক হোক বা দেশের জাতীয় সংসদ হোক কিংবা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত হোক সবকিছুই বাতিল অহি-র বিধানের সামনে, যদি না ঐ সিদ্ধান্ত অহি-র বিধানের অনুকূলে হয়। এই আক্বীদা ও বিশ্বাস নিয়ে যারা দুনিয়ায় বসবাস করেন ও তা স্বীয় ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে তৎপর থাকেন, তারাই সত্যিকারের মুসলিম। আল্লাহ বলেন, وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, 'হক্ব' তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে আসে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা বিশ্বাস করুক, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা প্রত্যাখান করুক। আমরা সীমা লংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' (কাহাফ ২৯)। لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ 'প্রেরিত এই কিতাবের মধ্যে বাতিল ঢুকতে পারেনা সম্মুখ থেকে, না পিছন থেকে। উহা অবতীর্ণ হয়েছে মহা বিজ্ঞানী ও মহা প্রশংসিত সত্তার নিকট হ'তে (হা-মীম সাজদাহ ৪১-৪২) রাসূল (ছাঃ) নিজের মুখের দিকে আংগুলের ইশারা করে বলেন, والذى نفسى بيده لا يخرج منه الا الحق। 'যে সত্তার হাতে আমার জীবন সমর্পিত সেই আল্লাহ্র কসম করে বলছি যে, এই মুখ থেকে 'হক্ব' ব্যতীত বের হয় না।[১৬] পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম গ্রন্থে পরিবর্তন ঘটেছে এমনকি বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু কুরআন অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। বস্তুতঃ কুরআনই রাসূলের জীবন্ত মু'জিযা।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কাঠিন্য চান না' আয়াতের শেষাংশে একথা বলার মাধ্যমে এ বিষয়ের দিকে ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামে কৃচ্ছ্র সাধনার স্থান নেই। অন্যান্য ধর্মে যেভাবে অতি ধার্মিকতার নামে বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন চালু করে মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করার চেষ্ট করা হয়। কোন ধর্মে অবিবাহিত থাকাকে প্রশংসার নযরে দেখা হয়, কোন ধর্মে ঘর-বাড়ী সংসার ছেড়ে বন-জঙ্গলে গিয়ে জটাধারী নোংরা হয়ে ধ্যান করাকে প্রকৃত ধার্মিক হিসাবে গণ্য করা হয়। মুসলমানদের কেউ কেউ জটাধারী নেংটা ফকির হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কেউ নিজেদের তৈরী করা হরেক রকম লতীফার যিকর করে গলদঘর্ম হয়। লোকেরা ভাবে এরাই আসল ধার্মিক। এই ধরণের কোন বাড়াবাড়ির স্থান ইসলামে নেই। ছিয়াম পালনের মধ্যেও কোন কাঠিন্য রাখা হয়নি।

১৬.হাকেম ১/ ১০৫, সিয়ার আ'লামুন নুবালা ৩/৮৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রোগী, মুসাফির, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মা-বোনদের জন্য সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সক্ষমদের জন্যও কেবল ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়ামের বিধান রাখা হয়েছে - রাতের জন্য নয়।

وَلِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 'এগুলি এজন্যে যে, তোমাদেরকে হেদায়াত দানের কারণে তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করবে ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে'। অর্থাৎ ছিয়ামের বিধান, নুযুলে কুরআন প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ যে তোমাদের হেদায়াত প্রদান করেছেন, তার মূল উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, তোমরা সবদিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল ব্যাপার কেবলমাত্র আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণা করবে ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। শুধুমাত্র জোরে শোরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দেওয়ার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। বরং আক্বীদা ও আমলে যথার্থভাবেই আল্লাহ ও তাঁর বিধানের সার্বভৌমত্বকে মেনে নিতে হবে। এক মুখে 'আল্লাহ আকবর' ও অন্য মুখে জনগণের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা, কাজে-কর্মে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বত্র আল্লাহ বিরোধীতা কখনো প্রকৃত ঈমানদারীর প্ররিচায়ক নয়।

অত্র আয়াতের আলোকে ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে সরবে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীর পাঠ করাকে সুন্নাত করা হয়েছে। ইবুন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলের ছালাত শেষ হয়েছে এটা আমরা পিছন থেকে বুঝতে পারতাম তাঁর তাকবীর ধ্বনি শুনে'। একই কারণে জমহুর বিদ্বানগণ মাসব্যাপি ছিয়াম পালন শেষে ঈদুল ফিৎরের দিন উচ্চ কণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করাকে 'মুস্তাহাব' বলেছেন। ইমাম দাঊদ যাহেরী উক্ত আয়াতের আলোকে ঈদের দিন তাকবীর ধ্বনি করাকে 'ওয়াজিব' বলেছেন। যদিও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) একে কেবল ঈদুল আযহাতে জায়েয বলেছেন, ঈদুল ফিৎরে নয়।[১৭] শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখার পর থেকে পরদিন ঈদুল ফিৎরের খুৎবা শেষ হওয়া ও বাড়ীতে ফেরা পর্যন্ত তাকবীর বলা উচিত। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাকবীর বলতেন 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ'।[১৮]

পরিশেষে বলব রামাযান মাস মুসলমানদের জন্য নৈতিক প্রশিক্ষণের মাস। আত্মশক্তি উন্নয়নের মাস। কুরআন পঠন ও পাঠনের মাস। কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন ও গবেষণার মাস। সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান কায়েমের শপথ গ্রহণের মাস। আল্লাহ্র বড়ত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণার মাস। সর্বোপরি উন্নত মানুষ হওয়ার সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণের মাস। এ মাসের নৈতিক প্রশিক্ষণ বাকী ১১টি মাস মুমিনকে হক -এর পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে ধরে রাখবে। অতএব আসুন! আমরা প্রকৃত মুমিন হই! উন্নত মানুষ হই!!

১৭.ইবনু কাছীর ১/২২৩-২২৪; ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৮৩।

১৮.ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৮৪।

দরসে হাদীছ

নেকীর প্রতিযোগিতা কর

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمائَةِ ضعْفٍ، قال الله تعالى: إلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنَا أَجْزِيْ بِه، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وطَعَامَهُ من أَجْلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِه، وفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّه، وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ والصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ،، متفق عليه - مشكوة "كتاب الصوم" ح/١٩٥٩

১। **অনুবাদঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, বনু আদমের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব ১০গুণ হ'তে ৭০০গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, তবে ছওম ব্যতীত। কেননা ছিয়াম আমার জন্য রাখা হয় এবং ওটার ছওয়াব আমি নিজে দেব। এ জন্য যে, ঐ ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির চাহিদা এবং খানাপিনার আকাংখা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছে। ছায়েমের জন্য দু'টি খুশীর মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতার কালে ও অপরটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। ছায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ছিয়াম পালন করবে, তখন সে যেন মন্দ কথা না বলে ও অযথা শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা লড়াই করতে আসে, তবে সে যেন বলে যে, 'আমি ছায়েম' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ছওম' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ১৯৫৯)।

২। **রাবীর পরিচয়ঃ** ছাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাদীছজ্ঞ, তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, আবেদ, যাহেদ, বিনয়ী, শীর্ষস্থানীয় মুফতী ও ফকীহ ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর জাহেলী যুগের নাম আবদু শাম্স (সূর্যের গোলাম) বা আব্দু আমর। ইসলামী নাম আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত

http://islaminonesite.wordpress.com

অন্যূন ৩৫টি নামের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ নাম আব্দুর রহমান বিন ছাখ্র আদ-দাওসী। ইয়ামনের দাওস গোত্রের লোক হিসাবে দাওসী বলা হয়। ছোট থেকেই তিনি বিড়াল ভালবাসতেন। ইবনু আব্দিল বার হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আমার জামার আস্তিনে করে একটি বিড়ালছানা নিয়ে আসছিলাম। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তা দেখে ফেলেন ও বলেন, ওটা কি? আমি বললাম, বিড়ালছানা। তখন তিনি বল্লেন, 'তুমি বিড়ালছানার পিতা বা আবু হুরায়রা'। هِرَّةٌ (হির্রাতুন) বিড়াল, هُرَيْرَةٌ 'ছোট বিড়াল' ابو هَرِيرة 'ছোট বিড়ালের বাপ' (মিরক্বাত ১/ ৬৯)।

উক্ত লকবের মাধ্যমে একদিকে রাসূলের (ছাঃ) হালকা রস সংযুক্ত সাহিত্য বোধ-এর পরিচয় পাওয়া অন্যদিকে সাথীদের সাথে তাঁর খোলামেলা ও গভীর আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন ছাখ্র নিজের জন্য রাসূলের (ছাঃ) দেওয়া 'আবু হুরায়রা' নামটিকেই বেশী পসন্দ করেন। দুনিয়ার মুসলমানের কাছেও তিনি 'আবু হুরায়রা' নামেই সমধিক পরিচিত। অধিকাংশ লোকই তাঁর আসল নামের খবর রাখে না। কিন্তু আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নাম জানে না এমন মুসলমান পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ।

ইমাম হাকেম, আবু আহমাদ বলেন, 'আবু হুরায়রা' এই কুনিয়াত বা উপনামটিতে তিনি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যে, মনে হয় তাঁর আর কোন নামই নেই। ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের বছরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ও খায়বার যুদ্ধে যোগদান করেন। অবিবাহিত এই যুবক ছাহাবী হাদীছ লেখার তীব্র আকাংখায় সর্বদা রাসূলের (ছাঃ) সাথে থাকতেন। মুহাজির ছাহাবীগণ ব্যবসা ও আনছারগণ সাংসারিক ঝামেলায় ব্যস্ত থাকলেও তিনি রাসূলের (ছাঃ) সঙ্গ ছাড়তেন না।

একদা তিনি রাসূল (ছাঃ) -কে বলেন, 'হে আল্লাহ্র নবী! আমি আপনার নিকট থেকে বহু হাদীছ শুনি ও স্মৃতিতে ধরে রাখি। কিন্তু ভয় হয় যদি কখনো ভুলে যাই। তখন রাসূল (ছাঃ) বল্লেন, اُبْسُطْ رِدَاءَكَ 'তোমার চাদর মেলে ধরো'। তিনি মেলে ধর্রলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর দুই হাত একত্রিত করে চাদরের উপরে মলে দিলেন এবং বল্লেন, এবার গুটিয়ে নাও। তিনি গুটিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেন যে, এই ঘটনার পর থেকে আমি আর কিছুই ভুলিনি' (মিরআত)।

ইমাম বুখারী বলেন, ছাহাবী ও তাবেঈ মিলে তাঁর নিকট থেকে অন্যূন ৮০০ ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৫৩৬৪টি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে ৩২৫টি, বুখারী এককভাবে ৩৯০টি ও মুসলিম এককভাবে ১৯০টি হাদীছ স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

তিনি মদীনার আমীর (গভর্ণর) ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের প্রথম অবস্থায় তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থানরত 'আছহাবে কুফ্ফা'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং প্রচন্ড ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট ভোগ করেন। মদীনাতেই জীবন কাটিয়েদেন তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী ও খাদেম তিনজন পালাক্রমে জেগে থেকে রাত্রিতে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আল্লাহ্র রসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য খাছ দো'আ করে বলেছিলেন, اللهم حبب عبدك هذا وامه الى عبادك المؤمنين و حببهم اليهما 'হে আল্লাহ আপনি আপনার এই বান্দাটিকে ও তাঁর মাকে আপনার মুমিন বান্দাদের নিকটে প্রিয় করুন এবং তাদেরকে এ দু'জনের প্রিয় করুন'(আহমাদ)। রাসূলের (ছাঃ) এই প্রিয় ছাহাবী সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ৫৯ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং 'বাক্বী' কবরস্থানে সমাহিত হন।*

৩। **সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ** উক্ত হাদীছে- ছায়েম মুমিনদের জন্য ছওমের বিশেষ ফযীলত ও ছওয়াবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সকল ইবাদতের নেকী সংখ্যায় বর্ণনা করা হ'লেও ছিয়ামের নেকীর কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এর নেকী স্বয়ং আল্লাহ দিবেন। কত দিবেন তা বলা হয়নি। সঙ্গত কারণেই ধরে নেওয়া যায় যে, তা হবে বেশুমার। তৃতীয়তঃ সকল নেক আমলের ছওয়াব বর্ণিত হ'লেও ছিয়মের নেকীর পরিমান এজন্য গোপন রাখা হ'তে পারে যে, ছিয়াম সত্যিকার অর্থেই একটি গোপন ইবাদত। অন্যান্য ইবাদত লোকে দেখতে পায়। ফলে সেখানে ইবাদতকারী মুছল্লী, হাজী বা যাকাত দাতার মধ্যে রিয়া বা লোকদেখানো মনোবৃত্তি জাগতে পারে। কিন্তু ছিয়াম পালনকারী মুখ দিয়ে নিজের ছিয়ামের কথা না বলা পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না এবং তিনি গোপনে এক ঢোক পানি পান করলেও কেউ দেখতে পান না। তবুও তিনি শত কষ্ট ও আবেগকে দমন করে ছিয়াম পালন করে যান, কেবল আল্লাহ্র ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। যেহেতু তার এই গোপন ইবাদত অতীব কঠিন ও রিয়ামুক্ত, সেকারণ তার ছওয়াবও হবে অগণিত ও বেশুমার-যা গোপনে আল্লাহ নিজে প্রদান করবেন। পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য পরীক্ষার্থী যেভাবে ফলাফল ঘোষণার দিনটির জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে, তেমনি ছায়েম তার অজানা ছওয়াব স্বয়ং আল্লাহ্র নিকট থেকে পাবার জন্য তাঁর দীদার লাভের উদগ্র বাসনায় ব্যাকুল থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com

এজন্যই বলা হয়েছে ছায়েমের জন্য দু'টি খুশীর মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে দুনিয়াবী সাময়িক খুশী এবং অন্যটি আল্লাহ্র দীদারকালে আখেরাতের চিরস্থায়ী খুশী। ঐদিন জান্নাতী মুমিনগণ আল্লাহ্কে তাদের সম্মুখে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্পষ্ট দেখতে পাবে। কিন্তু জাহান্নামীগণ বঞ্চিত হবে। আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার দীদার লাভের তাওফীক্ব দাও- আমীন!!

الصِّيَامُ جُنَّةٌ - 'ছিয়াম' মুমিনের জন্য ঢাল স্বরূপ। কেননা ছিয়াম তাকে অন্যায়-অপকর্ম হ'তে বিরত রাখে এবং ছিয়াম কবুল হ'লে সে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়।

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ.....صَائِمٌ - হাদীছের শেষাংশে ছওমকে পরিচ্ছন্ন ও কবুলযোগ্য করার জন্য বিশেষ একটি পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। সেটি হ'ল যথাসম্ভব চুপ থাকা এবং দুনিয়াবী শোরগোল ও ঝক্কি-ঝামেলা হ'তে দূরে থাকা। এ কারণে ছায়েমের জন্য তার মুখ ও হাতকে সংযত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এ দু'টিই হ'ল যাবতীয় অপকর্মের মাধ্যম। অন্য হাদীছে এসেছে اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ 'প্রকৃত মুসলিম সেই যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে' (বুখারী ও মুসলিম)। ছায়েমকে একমাস ধরে এর কঠোর প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কেননা এটাতে ব্যর্থ হ'লে তার ছিয়াম ব্যর্থ হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা অন্য হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، رواه البخارى، مشكوة ح/١٩٩٩- 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ছাড়তে পারল না, তার খামাখা খানাপিনা ত্যাগ করার আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।*

এই কঠোর ধমকি মনে রেখে ছিয়াম পালন করলেই ছিয়ামের সার্থকতা হবে। লন্ড্রীতে কাপড় দিলে যদি তা পরিচ্ছন্ন ও পারিপাটি না হয়, বরং আগের মতই ময়লাযুক্ত থাকে তবে তা ধোয়া হ'লেও যেমন কাপড়ের মালিক তা ফেরত দেন। অমনিভাবে খানাপিনা ত্যাগ করার ফলে বিধান মোতাবেক ছায়েম বলা গেলেও তার ছওম যদি ময়লাযুক্ত হয়, তবে তা আল্লাহ্র নিকটে কবুল না হবারই সম্ভাবনা বেশী।

দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের ছওমগুলিকে রেওয়াজী ছওমে পরিণত করেছি। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে কোনরূপ নৈতিক উন্নয়ন চোখে পড়ে না। রামাযান মাসেই দুর্নীতি যেন হিংস্র হায়েনার মত মুসলিম সমাজকে হামলা করে। ব্যবসায়ী তার পণ্যের মূল্য বাড়ায়, ঘুষখোর অফিসার-কেরানীরা নির্লজ্জভাবে ঘুষ হাতিয়ে নেয়। রাজনৈতিক নেতারা এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও লাগামহীনভাবে মিথ্যা কথা বলেন। চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা তাদের অপকর্ম বাড়িয়ে দেয়। এটা যেন রামাযানের পবিত্রতার বিরুদ্ধে একটা অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা। যেদেশের মুসলমানেরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তাদের উপরে আল্লাহ্র রহমত কিভাবে নেমে আসবে? আল্লাহ গাফূরুর রহীম না হ'লে আমাদের মত পাপীদের জন্য স্রেফ গযব ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার ছিল না।

রামাযানের শুরু থেকে জাহান্নামের দরজা বন্ধ ও জান্নাতের দরজা খোলা থাকে। কারণ এই সময় মুমিন গুনাহে কবীরা থেকে দূরে থাকে। ফলে জাহান্নামে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। জান্নাতের দরজা খোলা থাকে। কেননা এই মাসে মুমিন বেশী বেশী নেকী করে যা অবিরত ধারায় আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছতে থাকে। ফলে বিশেষ সময়ে দিন রাত অফিস খোলা রাখার ন্যায় বান্দার অসংখ্য নেকী জমা করার জন্য জান্নাতের দরজা সর্বদা খোলা রাখা হয়। আর এই নেকী লাভের জন্য অন্য হাদীছে দু'টি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। সেটি হ'ল ايمان و احتساب 'ঈমান ও ইহতিসাব'। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদারী ও ছওয়াবের আশায় যদি কেউ ছিয়াম পালন করে তবেই সে ব্যক্তির পিছনের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। পরন্তু অত্র হাদীছ অনুযায়ী আল্লাহ্র নিজস্ব পুরস্কার দানের বিষয়টিতো রয়েছেই।

অতএব ছিয়ামের রেওয়াজ পালন নয় বরং সত্যিকার অর্থেই ছিয়াম পালনের জন্য সকল মুমিনকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আর এ জন্যই নিজের মধ্যে নেকী উপার্জনের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। সকল অন্যায় থেকে তওবা করব এবং অন্য মাসে যা নেকী করি, এমাসে তার চাইতে বেশী করব- এই মনোভাব থাকতেই হবে। আগামী রামাযান আমার ভাগ্যে আর না-ও আসতে পারে।

অতএব আসুন! এ বছরে যারা আমরা রামাযান পেয়েছি, তারা হৃদয়ভরে রামাযানকে স্বাগত জানাই ও তার বরকত ও ছওয়াব উপার্জনের জন্য প্রতিযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করি। আমাদের এই নোংরা স্বার্থপর সমাজকে কল্যাণময় পবিত্র সমাজে পরিণত করার শপথ নেই।

কুরআন নাযিলের এই মহিমান্বিত মাসে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পরিশুদ্ধ করি এবং অহি-র বিধান অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করি। এটা করতে পারলেই রামাযান ও ঈদুল ফিৎর আমাদের জন্য সার্থক হবে।

* (বুখারী, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১৯৯৯)।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবন্ধ

ছাদেকপুর, পাটনাঃ

(স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র ও আত্মত্যাগের লীলাভূমি)

মূলঃ ক্বাইয়ূম খিযির

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী

ভারতীয় উপমহাদেশে বেনিয়া শাসক গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত ও নির্যাতিত স্বাধীনতা সংগ্রামের মুসলিম বীর সেনানীদের আত্মত্যাগের যে লোমহর্ষক ইতিহাস এ যাবৎ লিখিত হয়েছে, যার কিছু বর্ণনা পাঠক মহল শুনেছেন, তা অসম্পূর্ণ। মূলতঃ বীর মুজাহিদ ও বীর শহীদানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের করুন ইতিহাস এখনও পূর্নমাত্রায় মসীর ঝলকে চিত্রিত হয়ে ওঠেনি। আজও সেই আযাদী আন্দোলনের বেদনাবিধূর ঘটনাপুঞ্জের করুন আহাজারীর গুন শুনতে পাওয়া যায়। এই ইতিহাসের প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি অক্ষরে ভেসে ওঠে বৃটিশ কয়েদখানায় বন্দী মুজাহিদের শৃংখলিত ও অসহায় জীবনের সকরুন দৃশ্য।

এমন খুন ঝরা ইতিহাসের কলংকময় যুগ ছিল ১৮৫৭ সাল। যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী অগ্নিশিখা নিদারুন সংকটময় পরিস্থিতির ভস্মস্তুপে চাপা পড়েছিল। কারণ তখন ভারতবাসী বৃটিশ কুটনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছিল। অবস্থা এতই বেগতিক ছিল যে, উহা থেকে মুক্তি লাভের কোন পথ তারা খুজে পান নি। বিশেষতঃ বৃটিশ শাসকদের অত্যাচার এমন চরমে পৌছেছিল যে, সে সময় نه كوئ غنچه مسكرا سكتا تها اور نه شبنم روسكتي تهي 'হাসতো না কাননে ফুল কলি, আর ঝরাতোনা শিশির কণা অশ্রুধারা।' এমন দাবদাহ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মাঝেও মুজাহিদদের বিপ্লবী চেতনা হ্রাস পায়নি বরং এমন সংকটময় মুহূর্তেও তাঁরা আবার জিহাদের ডাক দিয়ে যান।

এই মুজাহিদদের মধ্যে পাটনার ছাদেকপুরের নিবেদিতপ্রাণ ওলামায়ে কেরাম অন্যতম। ইতিহাসের স্বরণীয় ও বরণীয় এ সকল ব্যক্তিত্ব তৎকালীন দগ্ধ প্রায় নির্যাতিতদের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বালাময়ী দৃপ্ত প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ও শাহ ইসমাঈল শহীদের পরিচালনায় সংঘটিত জিহাদ আন্দোলনে জিহাদের ময়দানে এঁরা যেভাবে আত্ম কুরবানী দিয়েছেন, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলমানদের মধ্যে যদিও আক্বীদাগত কিছু মতপার্থক্য আছে, তবুও এমন কঠিন আত্মত্যাগের বাস্তব ইতিহাস কেউ অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করতে পারবেনা। এমনকি কোন দেশপ্রেমিকের পক্ষে তা অস্বীকার করাও সম্ভব নয়। বাস্তবিকই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদত বরণকারী মুজাহিদদের স্মরণে আজও উপমহাদেশের ইতিহাস শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

১৭৬৬ সালে মুঘল সম্রাট শাহ আলম যখন পাটনায় আগমন করেন, ঠিক তখনই ইতিহাসের পাতায় ছাদেকপুর খানদানের পরিচয় ঘটে। সে সময় সম্রাট শাহ আলম শায়খ ছিবগাতুল্লাহ[১] ওরফে রুহুদ্দীন হোসাইন খাঁনকে বিহার প্রদেশের 'নায়েবে নাজিম' (লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট গভর্ণর) নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে বহু সম্পদ ও সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করেন। রুহুদ্দীন খানের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র রফিউদ্দীন খান স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে তাঁর কন্যা জুমরুনের সাথে ছাদেকপুরের প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য মৌলভী ফৎহ আলী[২] পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই শাহী বন্ধন ঐ বংশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিতে সীমাহীন পরাক্রান্ত করে তোলে।

অতঃপর ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৭৯০ সালে মৌলভী ফৎহ আলীর গৃহ আলোকিত করে মহান আল্লাহ তাঁকে এক সুসন্তান দান করেন। তিনিই সেই ইতিহাস খ্যাত সন্তান মাওলানা বেলায়েত আলী। পরবর্তীতে যাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য ছাদেকপুর পরিবারের গৌরবময় ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

الدر المنثور গ্রন্থ প্রনেতা মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরীর বর্ণনা অনুযায়ী বেলায়েত আলীর লালন-পালন তাঁর নানা লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট গভর্ণর রফিউদ্দীন হোসাইন খাঁনের গৃহেই সুসম্পন্ন হয়।

---

১. শায়খ ছিবগাতুল্লাহ ওরফে রুহুদ্দীন খাঁন আওয়ালপুর মৌজার অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি পাটনা সিটির মোঘলপুরা মহল্লায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। কারণ তাঁর পিতা শায়খ হোদায়াতুল্লাহ রাজা রাম নারায়ণ মৌজুর দরবারে ঠিকাদারী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই পিতার সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। অতঃপর ১৭৬৫ সালে যখন সম্রাট শাহ আলম পাটনায় আসেন, তখন তিনি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের আচরণ সব তুলে ধরেন। ফলে সম্রাট তাঁকে বিহার প্রদেশের লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং বহু ধন-সম্পদ প্রদান করেন। রুহুদ্দীন হোসাইন খাঁনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রফিউদ্দীন হোসাইন খাঁন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে নানমুহিয়া, পাটনার অধিবাসী শাহ মুহাম্মাদ আযীয ওরফে শাহ দরগাহীর কন্যা শুকরুন নেছার সঙ্গে রফিউদ্দীন হোসাইন খাঁর বিবাহ হয়। সেই শুকরুনের গর্ভে জন্ম হয় ঝুমরুন নাম্নী এক কন্যার। যার সাথে ছাদেকপুরের মৌলভী ফাৎহ আলীর বিবাহ হয়। তথ্য-الدر المنثور।

২. মৌলভী ফৎহ আলীর পিতা মাওলানা আহমদ আলী গেয়া জেলার জাহানাবাদ মহকুমার প্রসিদ্ধ স্থান আরদাল পরগনায় কাজী পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কর্মে খুশী হয়ে সম্রাট শাহ আলম তাঁকে বহু ধন-সম্পদ দান করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

সেখানে তিনি শাহজাদার মত বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন খানিকটা বিলাসপ্রিয়। সেই সৌখিন সময়ে তাঁর বিলাসিতার মাত্রা অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তিনি মৌসুমী পোষাকে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। সুন্দর কারুকার্য খচিত মশৃণ ও পাতলা পোষাক, কখনও রাজকীয় পোষাক, আবার কখনও দামী নক্সীদার পোষাকে তিনি সুসজ্জিত থাকতেন। সুগন্ধি ও সুঘ্রান ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। মুশ্‌কে আম্বরের সুগন্ধিযুক্ত কেশ তৈলে সুবিন্যাস্ত কেশরাশি এমনভাবে আলুলায়িত থাকতো, যেন তাতে সর্পিনীরা লুকোচুরি খেলছে। তাঁর নয়নাভিরাম চক্ষুযুগল সুরমার সুষমায় এমন উজ্জল ছিল যে, তথায় হরিণাক্ষিও যেন ম্লান হয়ে যায়।

দাঁতের উজ্জলতা ও ওষ্ঠে পানের আবীর মাখা মুখটি যেন মায়ের আঁচলে মুচকি হেসে লুকাতে চায়। মেন্দীর আবীরে রঞ্জিত হস্তদ্বয় যেন স্বচ্ছ কাঁচের উপর সূর্য কিরণের লাল আভা। অঙ্গুলের প্রতি গ্রন্থিতে স্বর্ণের আংটি এবং কব্জিতে রৌপ্যের বালা যেন তারকারাজির জ্যোতির্ময় শোভা। পরনে নিলেন কাপড়ের চুরিদার পাজামা পায়ের গ্রন্থির উপর শোভা পাচ্ছে এবং আট্‌সাট্ পাঞ্জাবী দেহের উপর দোল খাচ্ছে, যেন মনে হয় ঢেউয়ের উপর ঢেউ লুটোপুটি করছে। আর ধুসর বর্ণের পাদুকা সুসংলগ্ন পদদ্বয়কে যেন স্বাগত জানাচ্ছে। তিনি যখন পালকিতে চড়ে বৈকালে ভ্রমনে বের হতেন, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়ে সুগন্ধি ও সৌরভের বাহার এমনভাবে বিচ্ছুরিত হ'ত, যেন আশে-পাশের কুসুম কাননে ফুল কলিরাও সৌরভে ফুটে উঠতো। বাস্তবিকই বেলায়েত আলীর যৌবন তরঙ্গ তাঁকে এমন রসরঙ্গ ও বিলাসিতায় ভাসিয়ে দিয়েছিল যে, দিল্লীর শাহাজাদা ও অযোধ্যা'র নবাবদের বিলাস ব্যাসন তাঁর কাছে হার মানত।

কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল রঙ্গিন মানস যুবকের মুক্তচিন্তা, মেধা ও স্মৃতিশক্তি এতই তীক্ষ্ণ এবং প্রখর ছিল যে, চার বৎসর বয়োঃকালে মক্তবে শিক্ষা আরম্ভ করার পর মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রাথমিক পর্ব অনায়াসে শেষ করে ফেলেন। অতঃপর যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেছ মাওলানা রামাযান আলীর নিকট পুনরায় অধ্যয়ন ও শিক্ষা লাভ শুরু করেন। অতি শিঘ্রই তিনি সেখানকার শিক্ষা সমাপন করে আরও অধিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মানকুলাত ও মা'কুলাতের বিখ্যাত পন্ডিত লাক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গী মহলের মাওলানা আশরাফ আলীর শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করেন। মাত্র চার বৎসরের ব্যবধানে তিনি দ্বীনি শিক্ষার এমন রত্ন ভান্ডার সঞ্চয় করেন যে, শেষে তাঁকেই ওলামা ও ফোযালার পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

সে সময়ের কথা। যখন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী লক্ষ্ণৌতে আগমন করলেন, তখন মাওলানা বেলায়েত আলী তাঁর স্বনামধন্য ওস্তাদ মাওলানা আশ্রাফ আলীর সৌজন্যে সৈয়দ আহমদ ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। এমন পরিস্থিতিতে সৈয়দ ছাহেব তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রেক্ষাপটের উপর দু'ঘন্টা ব্যাপী এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা বিশেষতঃ মুসলিম সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর গরুত্বারোপ করেন। এই ভাষণ মাওলানা বেলায়েত আলীর মনে দারুনভাবে রেখাপাত করে। তাঁর মধ্যে কর্তব্য পরায়ণতা ও দায়িত্বানুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। নিমিষেই তাঁর পার্থিব চিন্তা ও বিলাসী মনোভাবের আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। বিদ্যার্জন শেষে তিনি পাটনায় ফিরে আসেন এবং ছাদেকপুরে স্বাধীনতা আন্দোলনের জিহাদী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেই জিহাদী কেন্দ্রটির স্মৃতি আজও গঙ্গা নদীর তীরে উজ্জলভাবে দৃশ্যমান।

১৮১৯ সালের কথা। মুজাহিদে আযম সম্মিলিত সিদ্ধান্তে মাত্র পঞ্চাশ জন বীর যুদ্ধা নিয়ে একটি রণতরী গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দেন। তরীটি ঢেউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে বেনারস ঘাট অতিক্রম করে দানাপুরে পৌঁছে। তাঁরা সেখানে অবস্থান নেন। অতঃপর ১৯শে মুহাররাম বুধবার আযিমাবাদের আদিম শেরশাহী কেল্লা[৩] সংলগ্ন একটি মাদ্‌রাসার নিকটবর্তী কূলে তরী ভিরান। মাদ্‌রাসার[৪] পিছনে তরীখানা নোংগর করা হয়। সৈয়দ ছাহেব সদলবলে গঙ্গাতীরে[৫] অবতরণ করেন। ইতিহাসের নুতন অধ্যায় তাঁদেরকে স্বাগত জানাল। আর সেখান থেকেই শুরু হ'ল জিহাদী কাফেলার শুভ যাত্রা।

'সিরাতে আহমদ শহীদ' গ্রন্থের বিবরণ মতে জানা যায় যে, সৈয়দ আহমদ ছাহেব মক্কা গমনের প্রাক্কালে প্রথম দু'সপ্তাহকাল পাটনাতেই অবস্থান করেন। পাটনাবাসী তাঁকে অত্যন্ত সম্মানজনক ভাবে স্বাগত জানান। বিশেষ করে ছাদেকপুরের বিখ্যাত আলেম ও বিত্তবান ব্যক্তি রাঈসে আযম মাওলানা এলাহী বখ্‌শ [৬] তাঁকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ

৩. বর্তমানে এই কেল্লাটি মাড়ওয়ার বংশীয় জালাল নামী এক ব্যক্তির মালিকানাধীন রয়েছে। ইহা 'জালান কেল্লা হাউস' নামে প্রসিদ্ধ।

৪.এই মাদ্‌রাসাটি সম্রাট শাহজাহানের বড় ভাই আযীয খাঁ প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাজ্ঞী মততাজ মহলের বড় বোন মালেকা বানুর সাথে আযীয খাঁ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি শাহজাহানের শাসনামলে বিহার প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তখন মাদ্‌রাসাটি কেল্লার সাথে সংযুক্ত ছিল। আর কেল্লা ছিল 'গভর্নমেন্ট হাউস'। বর্তমানে সেখানে আর মাদ্‌রাসার কোন চিহ্ন বিদ্যমান নেই। তবে সেখানে মাদ্‌রাসার প্রাচীর ও অভ্যন্তরে একটি গগণচুম্বী মিনার বিশিষ্ট মসজিদ ছাড়াও কিছু কিছু নিদর্শন রয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি 'মাদরাসা ওয়ালী মসজিদ' নামে খ্যাত।

৫. এ বিষয়ে জানতে হ'লে মাওলানা আবুল হাসান নদভী বিরচিত 'সিরাতে আহমদ শহীদ' পাঠ করুন!

৬. ছাদেকপুর খান্দানের ক্রমবিন্যাস হযরত ইমাম তাজ ফাকিহ্ -এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রথমে তিনি পাটনার মেহদানাওয়ায় বসতি স্থাপন করেন। পরে তিনি ছাদেকপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মাওলানা শায়খ হেদায়াত আলীর পুত্র মাওলানা এলাহী বখ্‌স-এর যশস্বি ও কৌলীন্যতা ছাদেকপুর খান্দানকে ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জল করে তুলে।

http://islaminonesite.wordpress.com

জানান এবং একটি ওয়াজ মাহফিলেরও আয়োজন করেন। সেখানে সৈয়দ ছাহেব এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। তাঁর ভাষণে প্রভাবিত হ'য়ে এলাহী বখ্শের চার পুত্র যথাক্রমে মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা ফাইয়াজ আলী, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী ও মাওলানা আকবার আলী সকলেই তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহন করেন। এই বায়'আত তাঁদেরকে জিহাদী অনুপ্রেরণায় ধন্য করে। এই সুযোগে মাওলানা ফৎহ আলী, মাওলানা কাজী শাহ মুহাম্মাদ হোসেন ও মাওলানা বেলায়েত আলীকে স্বহস্তে সৈয়দ ছাহেব খিলাফতের সনদ প্রদান করেন। তাঁদের প্রতি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব অর্পন করেন। ছাদেকপুর কেন্দ্র পরিচালনা, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করা এবং সর্বোপরি জিহাদী অনুপ্রেরণা তীব্রতর করার দায়িত্ব দিয়ে তিনি আপন গন্তব্য পথে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। এটা সেই যুগসন্ধিক্ষণ, যেখান থেকে ছাদেকপুর খান্দানের ইতিহাসে জিহাদী জীবনের নতুন ধারা সূচীত হয়।

সৈয়দ ছাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর নিযুক্ত খলীফাগণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দায়িত্বশীলতার সাথে জিহাদী কেন্দ্রকে আরও অধিকতর মজবুত ও সুশৃংখল করে গড়ে তুলতে তৎপর হন। অবস্থার দ্রুত পট পরিবর্তন হ'তে থাকে। ভেঙ্গে চুর্মার হ'তে থাকে ছাদেকপুর খান্দানের সর্ব প্রকার সুখরাজ্য ও বিলাসপূর্ন স্বপ্নকুটির।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁরা অবিশ্রান্ত; অথচ কঠিন ধৈর্য ও প্রবল সাহসিতকার সাথে এগুতে থাকেন। সাথে সাথেও নিঃশেষ হ'তে থাকে তাঁদের সৌখিনতা ও বিলাসপ্রিয়তা। এভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন।

এদিকে হজ্জব্রত পালন শেষে সৈয়দ ছাহেবের ফিরে আসার দিন ঘনিয়ে এল। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পবিত্র মক্কা ভূমিতে অবস্থানের পর ১৮২৪ সালে তিনি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে বোম্বে ফিরে আসেন।

সেখান থেকে কলিকাতার উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে পাড়ি জমান। অতঃপর সেখান থেকে নিজ গৃহ রায়ব্রেলীর দিকে যাত্রা করেন। তবে পথিমধ্যে কিছু কিছু জায়গায় বিশেষতঃ পাটনাতে কিছু সময় অতিবাহিত করার ধীর সিদ্ধান্ত নেন। এ সংবাদ পৌঁছে যায় ছাদেকপুর বাসীদের নিকট। তাঁরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন। তাঁদের দেহ-মন জুড়ে আনন্দ-উৎসাহ ও ত্যাজদ্বীপ্ততা বৈদ্যুতিক বেগে হিল্লোলিত হ'তে লাগল। সে সময় তাঁদের জিহাদের জোশ্ সকলকে অধীর করে রেখেছিল। তাঁদের এই জিহাদী জায্বার দৃষ্টান্ত মেলে একটি পদব্রজ কাফেলার বর্হিগমনের মাঝে। দেখা যায়, মাওলানা কাজী শাহ মুহাম্মাদ হোসাইনের নেতৃত্বে একদল স্বতঃস্ফুর্তভাবে পদব্রজেই সুদূর মুংগের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। এই উৎস্বর্গপ্রাণ জিহাদী কাফেলার মাঝে যুবক মাওলানা বেলায়েত আলীও ছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁর যৌবনের বাহার, বিলাসিতা ও সৌখিনতার পূর্ণ ধারা বহাল ছিল। তাঁর পরিধেয় পোষাকে নক্সীদার রেশমী কাপড় এবং মেন্দী রঙ্গে রঞ্জীত হাতের তালু ও নখ্ যেন ফালগুনে বসন্তের ছাপ। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী বিরচিত 'সিরাতে আহমাদ শহীদ' গ্রন্থের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

'সে সময় মাওলানা বেলায়েত আলী ফুলবাবুর মত ক্লীন সেভে থাকতেন। তাঁর স্বভাব ছিল মুক্তচিন্তা ও আধুনিকতায় গড়ে ওঠা। ফলে তখনও তিনি কিছু অনৈসলামিক পোষাক পরিধান করতেন। বিষয়টি সৈয়দ আব্দুর রহমানের দৃষ্টিতে বড়ই খারাপ লাগল। তাই তিনি সৈয়দ আহমাদ ছাহেবের নিকট এ বিষয়ে কিছু অভিযোগ পেশ করলেন। তদুত্তরে সৈয়দ ছাহেব বললেন, ইনশাআল্লাহ আমাদের এই জিহাদী কাফেলায় পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হ'লে তাঁর পোষাক ও স্বভাব প্রকৃতির সমূদয় পরিবর্তন হয়ে যাবে।' সারসংক্ষেপ এই যে, সৈয়দ ছাহেবের কাফেলা ছাদেকপুরের বীর সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে মুংগের থেকে বার অঞ্চল হয়ে পাটনা এসে পৌঁছলেন।

সে ১৮২৪ সালের কথা। কাফেলাসহ সৈয়দ ছাহেবের পাটনা আগমনের সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে তথায় উৎফুল্ল জনতার ঢল নামল। নগরবাসী আলোর পরশ পেতে পতঙ্গের ন্যায় ছুটে আসতে লাগল। এভাবেই ক্রমে জিহাদী কাফেলায় অংশ গ্রহনেচ্ছু স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা বেড়েই চলল। ফলে সাংগঠনিক মজবুতী ও শৃংখলা বিধানের নিমিত্তে একটি অস্থায়ী রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রবল ভাবে দেখা দিল। আট দিন সেখানে অবস্থানের পর যখন সৈয়দ ছাহেব নিজ গৃহ রায়ব্রেলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন মাওলানা বেলায়েত আলী এবং তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা এনায়েত আলী ও মাওলানা তালেব আলী স্বতঃস্ফুর্তভাবে জিহাদী কাফেলায় শামিল হন। এছাড়া তাঁর চাচাতো ভাই মাওলানা বাক্কের আলী সহ আরও অনেকেই এই কাফেলার সাথী হয়ে যান।

W.W. Hanter এর বর্ণনা মতে দেখা যায়, সৈয়দ ছাহেবের পালকির পিছনে পিছনে সাধারণ সেবীদের ন্যায় মুজাহিদ কাফেলা পদব্রজে ছুটেই চললেন। পাটনা থেকে যখন ফুলওয়ারী শরীফ এসে একদিন অবস্থান নিলেন, তখন ফুলওয়ারীর খ্যাতিমান আলেম জনাব সৈয়দ শাহ নিয়ামতুল্লাহ তাঁদের আতিথ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অতঃপর সৈয়দ ছাহেবের কাফেলা দীর্ঘ মানজিল অতিক্রম করে দিল্লীর পথে অগ্রসর হ'তে থাকল। তাঁর কাফেলা এখনও দিল্লী এসে পৌঁছায়নি; ইতোমধ্যেই তাঁর কানে পৌঁছল এক অশনিসংকেত। ১৮৬৪ সালের মে মাসে তাঁর শিক্ষাগুরু জিহাদ আন্দোলনের উদ্গাতা সৈয়দ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) ইহদাম ত্যাগ করে পরপারের যাত্রী হ'লেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে সৈয়দ ছাহেব দারুন মর্মাহত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

[চলবে]

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী

অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী

[যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি আসমান যমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এই সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন (সূরা ত্বীন-৪)। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'আমি বনী আদমকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি' (বনী ইসরাঈল ৭০)। তিনি সকলের পালনকর্তা এবং সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক। সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর আনুগত্য করে। কিন্তু মানুষ ও জ্বিন জাতি করে না।

যখন দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ তখন সকল সৃষ্টি জগতের উচিৎ হবে তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর আইন মেনে চলা। অথচ পৃথিবীর ও জ্বিন জাতি তা মেনে চলে না। কিছু লোক মেনে চললেও পুরোপুরি ভাবে নয়। আর যেটুকু মানে তাতেও মতভেদের অন্ত নেই। আর সে কারণে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মাস্‌আলা-মাসায়েল নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে দেখা যাচ্ছে। উক্ত মাস্‌আলা-মাসায়েলের মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টির উপর শায়খ খালেদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আল আম্বারী 'আল হুকমু বে-গায়রে মা আন্‌যালাল্লাহ' নামে একটি বই লিখেছেন। যার মধ্যে তিনি শাসকগণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের ফৎওয়া ও বক্তব্যগুলো তুলে ধরে কুরআন ও হাদীছের আলোকে এর সমাধান দিয়েছেন। বইটির অনুবাদ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। দো'আ করবেন আল্লাহ যেন আমার এই উদ্দেশ্য পুরণ করার তাওফীক্ব দান করেন। -অনুবাদক]

অতঃপর বহু লোক আছেন যারা নিজেদেরকে লেখক, পথ প্রর্দশক, আল্লাহ্‌র পথের দাঈ এবং মুফতী হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাদেরকে দেখলাম যে তারা শাসক গোষ্ঠীকে ঢালাওভাবে কাফের ফৎওয়া দিচ্ছেন। সালাফে ছালেহীন ও আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এ ব্যাপারে কি বলেছেন, তার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলো না। পরিণতিতে যে রাষ্ট্রদ্রোহীতা, ফেৎনা ও রক্তপাত হচ্ছে এবং ছোট বড় অনেক বিপদ নেমে আসছে, একজন অন্যজনের ধন-সম্পদ হালাল মনে করে নিচ্ছে, এছাড়া এর যে তিক্ত ফলাফল ও জঘন্য পরিণতি রয়েছে এ দিকে তারা মোটেই দৃষ্টিপাত করছেন না। এবং যারা তাদের বিরোধিতা করছেন তাদেরকে কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

আমি যখন দেখলাম যে, অনেক লোক কুফরী ফৎওয়া দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করছে এবং মুসলমানদের মান-ইয্যতের উপর আঘাত হানছে। আর মুসলিম উম্মাহ্‌কে এক একজন মানুষের নেতৃত্বে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলছে, তখন আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু লেখা সহজ মনে করলাম। এই বিষয়টি এমনি কঠিন যে, বড় বড় আলেমগণ এখানে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং গবেষকগণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সালাফে ছালেহীনের পথ অনুসরণকারী কিছু বিজ্ঞ ও মুত্তাক্বী লোক ছাড়া সঠিক পথের সন্ধান পায়না। অনুসরণীয় ইমাম ও সালাফে ছালেহীনের পথে যারা চলেন, তারা সালাফে ছালেহীন ও ইমামগণের নিয়মের বাইরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কথা বুঝার চেষ্টা করেন না। তাদের জ্ঞান ও পসন্দ তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যায় না। তারা কোন মাযহাব বা জামা'আতের বিরোধিতার পরওয়া করেন না এবং কেউ তাঁদেরকে ভীরু বা কাপুরুষ বলে তিরস্কার করলে তাতে কোন ভয় পান না। বরং তারা কুরআন ও হাদীছের শব্দগুলির সাথেই চলেন। আর যেখানে সেগুলি থেমে যায় সেখানে তারাও থেমে যান। তাদের প্রশংসায় কবি বলেন, ما كل من طلب المعالى نافذا – فيها ولا كل الرجال فحول 'যারা উচ্চাসনে আরোহণ করতে চায় সবাই তা পায় না এবং প্রতিটি লোক বীর বাহাদুরও হয় না'। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে ফায়ছালা করার জন্য মুমিনদের মন সব সময় উদগ্রীব হয়ে থাকে। কারণ তারা জানে যে, যখন তারা এটা বাস্তবায়ন করতে পারবে তখন তারা এমন প্রশংসার পাত্র হবে যে কেউ তাদের প্রশংসা করে শেষ করতে পারবে না। কবি বলেন, يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم – أيحيط ما يفنى بما لا ينفد

অর্থাৎ 'কথা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু প্রশংসা শেষ হবে না। কারণ যা শেষ হয়ে যায় তা কি কোন দিন যা শেষ হয় না তাকে বেষ্টন করতে পারে?'

বিগত যুগে বা বর্তমান যুগে যখন আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়িত হ'তে দেখা গেছে, তখন নিরুৎসাহিত লোকেরাও উৎসাহ বোধ করেছে এবং আশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বিশ্বাস পরায়ণদের জন্য আল্লাহ্‌র ফায়ছালার চেয়ে কার ফায়ছালা অধিক উত্তম হ'তে পারে' (সূরা মায়েদাহ ৫০)?

আল্লাহ্‌র ফায়ছালা ওয়াজিব হওয়া, ইসলামী শরীয়ত সময়োপযোগী হওয়া এবং সব সময় সব জায়গায় বাস্তবায়িত হ'তে সক্ষম হওয়া, এ ব্যাপারে দু'জন মুসলমানের মধ্যে দ্বিমত নেই এবং দু'জন মুমিন এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে না। এ কথাটি মানুষকে বুঝিয়ে বলার আগেই বুঝা যায়। যারা আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করতে বাধা দেয় তারা বড়ই যালেম। কারণ তারা একদিকে মানুষকে নিরাপত্তা ও শান্তি থেকে এবং সফলতা ও মুক্তি থেকে বঞ্চিত রাখছে অন্যদিকে জনগণের উপর মানব রচিত বিধান ও জাহেলী মতবাদ চাপিয়ে দিচ্ছে। অন্যায়গুলো প্রশ্রয় দিয়ে আদ্‌ল ও ইনছাফকে জলাঞ্জলি

http://islaminonesite.wordpress.com

দিচ্ছে। সাবধান! এই সমস্ত প্রকাশ্য অন্যায়গুলো যেন জ্ঞানীদের ও আহলে সুন্নাতের নিয়মাবলী যা গবেষণা ও দলীল সংগ্রহে সহায়ক, তা থেকে দূরে সরাতে না পারে এবং গুনাহের পথ আবিষ্কার থেকে বিরত রাখে।

দায়িত্ব বড় কঠিন এবং আমানতও বিরাট বড়, অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহ্ ছিন্ন ভিন্ন। তাদের মূল্যবান সম্পদগুলো ধ্বংস ও লুণ্ঠিত। তাদের একটা বড় অংশ প্রকৃত দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অনেকেই কষ্ট ও আযাবের মধ্যে পতিত। অল্প সংখ্যক দুর্বল লোক শরীয়ত মেনে চলে। তবে তারাও ইখতেলাফ নিয়ে ব্যস্ত। প্রচলিত দলাদলি ও জঘন্য বিদ'আত তাদেরকে ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে রেখেছে।

শাসকদের কাফের বলে এবং দায়িত্বশীলদের গাল-মন্দ করে এই যিল্লতী ও মুছীবত থেকে কি মুক্তি পাওয়া যাবে? এই পদ্ধতি আমাদের উম্মতের জন্য কতইনা ক্ষতি কারক হচ্ছে এবং তাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে রেখেছে ও যুব সমাজকে শরীয়ত মেনে চলা ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরা থেকে বিরত রেখেছে। এই কঠোর ফৎওয়া মুসলিম উম্মাহ্কে কি দিল? এর ফলইবা কি হ'ল? ভয়, দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, আল্লাহ্র দ্বীন হ'তে নফরত করা, পিছনে ফিরে যাওয়া, জেলে নিক্ষিপ্ত হওয়া, ফেৎনা, রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং একে অন্যের সম্পদ ও মান ইয্যতকে হালাল করে নেওয়া ছাড়া আর কি? ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

অন্য একদল লোক রাজনীতির কাদায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং আল্লাহ্র বিধানের সাথে নিজেদের কল্পিত জাহেলী আইনকে সমান ভাবে দেখানোর ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করছে। তারা এটাকে সংসদে পেশ করে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে ও ভোটা ভুটি করছে। তারা যদি ভোটে জিতে যায় অথবা সমান সমান হয়, তাহ'লে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করছে। তিনি হয় এটা মেনে নিচ্ছেন অথবা আবারও ভেবে দেখার জন্য ফেরত পাঠাচ্ছেন। যদি শরীয়ত পন্থীরা ভোটে হেরে যান অথবা সমান সমান হন, তাহ'লে শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা কর। যদি তারা একবার সফলকাম হ'ত (তাহলে কি যে করত তার ইয়ত্তা নেই)। তারা কোন দিনই সফলকাম হবে না। শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হ'বে শরীয়তের নিয়মানুসারে। এটা এ কারণে যে, তারা শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন অনেক কাজে লিপ্ত, যা মূল আক্বীদার সাথে এবং শরীয়তের অনেক শাখা প্রশাখার সাথে সংঘর্ষ শীল।

তারা এবং অন্যান্যরা অজ্ঞ অবস্থায় গাফেল হয়ে পৃথিবীতে বিচরন করছে। তারা প্রকৃত দ্বীনের প্রশিক্ষণ ও দ্বীনের আহকাম গুলির উপর আমল করার দাওয়াত দেওয়া থেকে এবং আদর্শ ও আদব-কায়দাগুলো গ্রহণ করা থেকে গাফেল রয়েছে, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে তাদের সহায়ক হ'ত এবং তাদের সফলতা এনে দিত ও নেতৃত্বের যোগ্য করে দিত।

[চলবে]

সুখবর! সুখবর!!

এতদ্বারা সকল লাইব্রেরী বই প্রকাশক, সাধারণ পাঠক-পাঠিকা, পাঠাগার, গ্রন্থাগার ও সম্ভ্রান্ত গ্রন্থনালয়ের মালিকদের জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত দুটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী মূল্যবান গ্রন্থ কেবলমাত্র আমরাই পরিবেশন করছি।

১। আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ,- লেখকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত মাননীয় লেখকের মূল্যবান ডক্টরেট থিসিস, যা দেশী-বিদেশী মনীষীবৃন্দ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। কম্পিউটার কম্পোজ, জাপানী অফসেট মুদ্রণ, বোর্ড বাঁধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৩৮ হাদিয়াঃ ৩০০ টাকা।

২। আর-রাহীকুল মাখতুম (বঙ্গানুবাদ)ঃ লেখক আল্লামা শফিউর রহমান মুবারকপুরী (ভারত)। বর্তমানে অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। নবী জীবনের উপরে রাবেতা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সেরা মনীষীদের রচিত বিভিন্ন ভাষার মোট ১১৮২ খানা পান্ডুলিপির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী ও ১৯৭৮ সালে বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার প্রাপ্ত অতুলনীয় সীরাত গ্রন্থ, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। বোর্ড বাঁধাই, হোয়াইট, ৪৩৮ ও ৪১৯ পৃষ্ঠা। হাদিয়াঃ ১৬০+১৬০= ৩২০ টাকা মাত্র।

এছাড়া পবিত্র রামাযান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মানিত ও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের লিখিত ও অনুদিত বই পুস্তক সহ যাবতীয় ইসলামী বই বিশেষ কমিশনে বিক্রি হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ সকল প্রকার ইসলামী বই ছাড়াও হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরীতে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার সমস্ত বই সুলভে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ
হাদীছ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন-তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার (আল-বাক্বারাহ ১৮৩)।

ছওমঃ অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হ'তে বিরত থাকাকে 'ছিয়াম' বলা হয়। ২য় হিজরী সনে 'ছিয়াম' ফরয হয়।

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাত্রি জাগরণ করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- আলবানী হাদীছ সংখ্যা ১৯৮৫)।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুন হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই রাখা হয় এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। সে তার যৌনাকাঙখা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সঙ্গে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশ্কে আম্বরের খোশ্বুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা কেউ লড়াই করতে আসে, তখন বলবে 'অমি ছায়েম'(বুখারী,মুসলিম, মিশকা-হা/ ১৯৫৯)।

মাছায়েলঃ

(১) ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ম অর্থ মনন করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। আরবী বা বাংলায় নিয়ত পড়বার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

(২) ইফতারের দো'আঃ রোযাদার বিস্মিল্লাহ বলে ইফতার করবে।

(৩) ইফতার শেষের দো'আঃ 'যাহাবায্ যামাউ অবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। 'পিপাসা দূর হ'ল, শিরাসমূহ প্রানবন্ত হ'ল এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে ছওয়াবও নিশ্চিত হ'ল (আবু-দাউদ, মিশকাত হা/ ১৯৯৩)।

(৪) রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/ ১৯৯৮)।

(৫) তিনি এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, ইয়াহুদ-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে' (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/ ১৯৯৫)।

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদি ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন' (নায়লুল আওতার মিশরী ছাপা ১৯৭৮ সন ৫/২৯৩)।

(৬) সাহারীর আযানঃ রাসূলের (ছাঃ) যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) দিতেন। তাই সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর। যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম ফজরের আযান দেয়' (বুখারী, মুসলিম,নায়ল ২/১২০)।

বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমানকালে (আযান ব্যতীত) সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত' (নায়লুল আওতার ২/১১৯)।

(৭) তারাবীহঃ (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাকা'আত বিতরসহ) এগারো রাকা'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করেননি'' (বুখারী, ১/১৫৪; মুসলিম, ১/২৫৪; মিশকাত হা/১১৮৮,১১৯১,১১৯২)।

(খ) তিনি প্রতি দুই রাকা'আত অন্তর ছালাম ফিরায়ে আট রাকা'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক রাকা'আত কখনও তিন রাকা'আত কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না। মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬,৭৩৭,৭৩৮।

(গ) ছাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন যে, ওমর ফারূক (রাঃ) উবাহ বিন কা'আব ও তামীম দারীকে (রাঃ) রামাযানের রাত্রিতে জনগণকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাকা'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন (মুয়াত্তা মালেক সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১৩০২)। উক্ত বর্ণনার শেষ দিকে ইয়াযীদ বিন রুমান প্রমুখাৎ ওমরের যামানায় লোকেরা ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেন বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়। দ্রঃ উক্ত হাদীছের পাদিকা, তাহ্কীক-আলবানী।

(ঘ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহারা' হিসাবে প্রমাণিত। অতএব বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

উল্লেখ্য যে, ২০ রাকা'আতের হাদীছগুলি দূর্বল, এর সূত্র ছহীহ নয়।

(১) ইবনে আব্বাসের হাদীছ-"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعةً والوتر" 'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ২০ রাকা'আত এবং বেতর নামায পড়তেন'। হাদীছটি আব্দুবনু হুমাইদ ও তাবারাণী আবু শাইবার সূত্রে বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য যে, আবু শাইবাকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু মাঈন, আবু দাউদ,

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ ইমামগণ যঈফ বলেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বুখারীর শরাহ 'ফাতহুল বারীতে' উক্ত সূত্রকে দূর্বল বলেছেন। তাছাড়া আয়শা (রাঃ) -এর হাদীছের সাথে উক্ত হাদীছটি সাংঘর্ষিক। আর হযরত আয়শা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) -এর রাত্রীকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্যের চাইতে বেশী অবগত ছিলেন। -ফাতহুল বারী ৪/২৫৪।

(২) "عن ابى الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة" আবুল হাসনা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন তাদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাকা'আত নামায পড়ে'। হাদীছটি ইবনু আবী শায়বা তার মুছান্নাফে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী তাঁর সুনানে বলেছেন, "و فى هذا الإسناد ضعف" অর্থাৎ 'এই সনদে দূর্বলতা রয়েছে'। শায়খ আলবানী বলেছেন, যঈফ হওয়ার কারণ হ'ল আবুল হাসানাকে চিনা যায় না সে কে? ইমাম যাহাবীও এটা বলেছেন এবং ইবনু হাজারও বলেছেন যে, সে অজ্ঞাত। আলোচনা দ্রঃ ছালাতুত্ তারাবীহ লিল নাছেরুদ্দীন আলবানী পৃঃ ৭৬-৭৭।

(৩) "عن ابى عبد الرحمن السلمى عن علىٍ قال دعا (أى على رضى الله عنه) القراء فى رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعةً قال: وكان على رضى الله عنه يوتر بهم" رواه البيهقى ٤٩٦/٢ – আব্দুর রহমান আস্-সুলামী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রাঃ) ক্বারীদেরকে রামাযান মাসে আহবান করলেন। অতঃপর (তারা জমায়েত হলে) তাদের মধ্যে একজনকে লোকদেরকে সাথে নিয়ে ২০ রাকা'আত নামায পড়ার আদেশ দিলেন এবং আলী (রাঃ) তাদেরকে সাথে নিয়ে বেতরের নামায পড়তেন। হাদীছটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ যঈফ। এই সনদে দু'টি দোষ রয়েছে। (১) عطاء بن السائب তার স্মৃতিশক্তি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। (২) حماد بن شعيب সে অত্যন্ত যঈফ। ইমাম বুখারী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর এ কথার দ্বারা "فيه نظر" 'তার ভিতর দেখার বিষয় রয়েছে'। তিনি একবার এ কথাও বলেছেন যে, এর হাদীছ অস্বীকৃত। আর তিনি এইরূপ কথা বলেন ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার থেকে রেওয়ায়াত করা হালাল নয়। -ছালাতুত্ তারাবীহ লিল আলবানী, ৭৭পৃঃ।

সুতরাং উক্ত হাদীছগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, ২০ রাকা'আতের হাদীছের উপর আমল করা যাবে না। কারণ হাদীছগুলি যঈফ বা দূর্বল।

(৮) লাইলাতুল কৃদরের দু'আঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'ফু আন্নী'। 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমা পছন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর' (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১)।

(৯) ফিৎরাঃ (ক) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১/৫৭০ পৃঃ হা/১৮১৫,১৮১৬)।

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট বড় সকল মুসলিম নর নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নেছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম সাড়ে ৫২ তোলা রূপার হিসাবে প্রায় ১০.০০০ (দশহাজার) টাকা এবং সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে ৫০.০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার সমান -এর মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলের (ছাঃ) যুগে মদীনায় গম ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমের অর্ধ 'ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়ার এই ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যারা অর্ধ ছা গমের ফিৎরা দেন, তারা মু'আবিয়ার (রাঃ) -এর অনুকরন করেন মাত্র। ইমাম নবভী (রহঃ) একথা বলেন। দ্রঃ ফাৎহুল বারী (মিশরী ছাপা ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।

(ঘ) এক 'ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজের পূর্ণচার অঞ্জলী চাউল।

(১০) ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাকা'আতে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১)। ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই। -নায়লুল আওতার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।

(১১) ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ

(ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফ্ফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০(ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় (নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪)।

(খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভূলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুরমা লাগালে, মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না (নায়ল ৫/২৭১-৭৫,২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ)।

(গ) অতি বৃদ্ধ, যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম তারা প্রতিদিন একজন করে মিস্কীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিস্কীন খাইয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদেরকে ছিয়ামের 'ফিদ্ইয়া' আদায় করতে বলতেন (নায়লুল আওত্বার ৫/৩০৮-১১ পৃঃ)।

(ঘ) মৃত ব্যক্তিদের ছিয়ামের ক্বাযা আদায়ের জন্য অনুরূপ ফিদ্ইয়া আদায় করা যাবে (নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ)।

অতএব আসুন! আমরা সকলে এই পবিত্র মাসের পবিত্রতা রক্ষা করে চলি এবং অধিক নেকী অর্জনে [illegible] আমাদেরকে তাওফীক [illegible]

http://islaminonesite.wordpress.com

ছিয়াম সাধনাঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে

-আব্দুল আউয়াল (রাঃ বিঃ)

মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেন, 'আমার ইবাদত (আনুগত্য) করার জন্যই আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি' [সূরা আয-যারিয়াত ৫৬]। আনুগত্য বলতে বুঝায় কথায়, কাজে ও বিশ্বাস-অনুভূতিতে সর্বদাই স্রষ্টার দেয়া বিধান মতে সমগ্র জীবন গড়ে তোলা। আর এ আনুগত্যতার জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা। এসব গুণাবলী একজন মানুষের মধ্যে তখনই পাওয়া সম্ভব হয় যখন তার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি বিদ্যমান থাকে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রামাযানের রোযা ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর। আর তা এ জন্য যে তোমরা আল্লাহ্‌ভীতি অর্জন করতে পারবে' [সূরা বাক্বারাহ ১৮৩]। একথা প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষের যাবতীয় ইবাদত নির্ভেজাল হওয়ার পথে একমাত্র অন্তরায় হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতির অনুপস্থিতি। যা রোযার মাধ্যমে অর্জন সম্ভব।

রোযা ইসলামের মূল পাঁচটি রুকনের অন্যতম এবং আরবী নবম মাসের নাম রামাযান। এ মাসে আল্লাহ্‌ মু'মিনদের উপর ছিয়াম বা রোযা ফরয করে দিয়েছেন। ছিয়াম বহুবচন; একবচনে ছাওম। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থগিত বা বিরত থাকা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত থাকার নামই ছওম বা রোযা। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান নফসকে (কুপ্রবৃত্তি) বিবেকের অনুশাসন মেনে চলার যোগ্য করে গড়ে তোলার মধ্যে রোযার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। নফ্‌স মানুষকে সাধারণতঃ অন্যায়, অসৎ, মিথ্যা ও পাপাচারের দিকে টানে। আর বিবেক তাকে সাধ্যমত বাধা প্রদান করে থাকে। ছওম সাধনা মানবের বিবেককে সহায়তা করে নফসের কোরাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে। তাই রোযা মু'মিনের জন্য ঢাল স্বরূপ, অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য। তবে তাতে অবশ্যই আল্লাহ্‌ভীতি বা পরহেযগারীতা বাঞ্চনীয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ছঃ) বলেছেন, 'রোযা থেকেও কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে এবং তদানুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করার (রোযা রাখার) আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নাই[১]।

ছিয়াম সাধনা মানুষকে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, ঘৃণা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ও মিথ্যা কথা বলার ন্যায় জঘণ্য পাপ থেকে বিরত রাখে। কেননা রোযা শুদ্ধ হবার জন্য উপরোক্ত অপকর্মসম যাবতীয় পাপ কাজ থেকে পরহেয করাকে শর্ত করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় অভুক্ত থাকার কারণে দরিদ্র, পীড়িত, ভূখা-নাঙ্গা অগণিত মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। এভাবে রোযা আমাদেরকে মানবিক গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তোলে।

রোযার দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে মহান দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন, 'মানুষকে আখলাকে ইলাহী তথা ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত করে তোলাই রোযার আসল উদ্দেশ্য[২]। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহইয়াউল উলুম'-এ রোযার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেনঃ

১। পরম প্রিয়তম আল্লাহ্‌ পাকের প্রেমে বিভোর ও তন্ময় থেকে ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার (যৌনাচার) এবং সকল প্রকার পাপাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকাই হলো প্রকৃত রোযা।

২। পানাহার, কামাচার এবং যাবতীয় পাপাচার পরিহার করা।

৩। শুধু পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকা এটি রোযার সর্বনিম্ন স্তর[৩]।

মানুষের মধ্যে যে পাশবিকতা রয়েছে; যে কু-প্রবৃত্তি মানুষকে অন্যায় অনাচারে ব্যাপৃত করে, সেই পশু প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে উন্নত আখলাকের অধিকারী হওয়াই রোযার মূল উদ্দেশ্য।

উপরে উল্লেখিত কুরআনুল কারীমের সূরা বাক্বারার ১৮৩ আয়াত থেকে আমরা জেনেছি পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের উপরেও রোযা ফরয করা হয়েছিল। ইয়াহূদীদের 'ইউম কিপ্পুর' উৎসবটি হচ্ছে ছিয়ামের উৎসব। এই দিনে তারা কর্ম থেকে বিরত থাকে, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে না এবং পাপের জন্য বিধাতার কাছে শাস্তি বিধান কামনা করে। 'ওল্ড টেষ্টামেন্টে' 'সংখ্যা' অধ্যায়ে ২৯ঃ৭ -এ বলা হয়েছেঃ You must deny yourselves and do not work. এ কথাটি তওরাতের ইংরেজি ভাষ্যে আছেঃ And you shall afflict your souls. 'এটাই মূল কথা ছিল, কিন্তু খৃষ্টানদের বাইবেলে এর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 'এ্যাফ্লিক্ট' করার অর্থ হচ্ছে শাস্তি প্রদান করা, উৎপীড়ন করা অথবা নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া। অর্থাৎ পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শরীর ও আত্মাকে কষ্ট দেওয়া। সেখানে ইসলামে রোযার উদ্দেশ্য দেহ ও আত্মাকে কষ্ট দেয়া নয়।

১. *আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত ছহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড। পৃ: ২৩৪, হাদীছ নং: ১৭৬৮।*

২. *সংগৃহীত, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ২২-২৮ জানুয়ারী ১৯৯৭ইং।*

৩. *সংগৃহীত, মাসিক অগ্রপথিক, জানুয়ারী ১৯৯৭ইং, পৃ: ৯।*

http://islaminonesite.wordpress.com

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্যদিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না- যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার দরূণ আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' [সূরা বাক্বারা ১৮৫]।

রোযা যে শুধুমাত্র আত্মিক উন্নতি এবং বেহেশত পাবার জন্য নয়, ইহা একটি স্বাস্থ্যসম্মত ইবাদত যা আজকের অতি উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। বড় প্রমাণ হলো স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে রোযা ফরয করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, রোগী ও পাগলের জন্য রোযা ফরয নয়। এমনকি রোযা রাখলে রোগবৃদ্ধির আশংকা থাকলেও রোযা ফরয নয়।

এবারে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযার উপকারিতা আলোচনা করব -

১। বদ্‌হজম (ডিস্‌পেপসিয়া)ঃ মানুষের অতি সাধারণ এবং বহুল পরিচিত রোগ বদ্‌হজম। যে রোগ সাধারণতঃ ক্ষুধার পূর্বে খাওয়া, অধিক পরিমাণে আহার করা, পরিশ্রমের পর বিশ্রামের পূর্বেই আহার করা ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত খাবার দ্রুতগতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের অংশে নেমে আসে ফলে ঐ খাদ্যের সংগে প্রয়োজনীয় এনজাইম সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়া করতে না পারায়, উক্ত খাদ্যের সংগে সিকামে অবস্থিত জীবাণু দ্বারা গ্যাস সৃষ্টি হয়। এর ফলে পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হওয়া, বমি হওয়া, এমনকি শুরু হ'তে পারে ইনডাইজেসটিভ ডায়রিয়া। এই ডায়রিয়া থেকে শুরু হবে ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা। পরিণামে মৃত্যুও হ'তে পারে[৪]। ডায়রিয়া এমন একটি ব্যধি যা বাংলাদেশের ১নং স্বাস্থ্য সমস্যা। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও এ রোগের চিকিৎসাতে তেমন কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই। শুধু ক্ষুধা না হলে খাবে না, ক্ষুধা হলে প্রথমে হালকা খাবার খাবে, বিশ্রামের পর খাবে, অতিভোজন থেকে বিরত থাকবে, এসব নিয়মগুলি মেনে চললেই এ মারাত্মক রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। রোযাদার ব্যক্তি রোযাব্রতের মাধ্যমে এ নিয়মগুলিই মেনে চলে। ফলে এ সময়ে মানুষ এ রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।

২। মেদ বৃদ্ধি (Obecity)ঃ অতিভোজন বা অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধির ফলে নানা ধরণের মারাত্মক ব্যধির সৃষ্টি হ'তে পারে। যেমন পেটের মাস্‌লে (পেশী) চর্বি বৃদ্ধির ফলে শরীরের নিম্নাংশের ভেইনে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ভেরিকোস ভেইন নামক রোগের সৃষ্টি হয়।

বুকের মাংসপেশীতে মেদ বৃদ্ধি হ'লে শ্বাস কষ্ট হ'তে পারে। মেদ বৃদ্ধির ফলে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ঘা হ'তে পারে। চর্বিযুক্ত শরীরে পিত্তপাথর (Gallstone) বেশী হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে হ'তে পারে অবস্ট্রেকটিভ জণ্ডিস, অপারেশন ছাড়া যার কোন ফলপ্রদ চিকিৎসা নেই। মেদ বৃদ্ধির ফলে হাঁটুতে বাত, কোমরে বাত বেশী হয়ে থাকে। মেট্রোপলিটন লাইফ ইনস্যুরেন্স কোং (U.S.A) -এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, স্বাভাবিকের চেয়ে ১৬ কেজি ওজন বৃদ্ধির জন্য গড় আয়ু ৪বছর কম হয়[৫]।

রোযা শরীরের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে ফেলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। রোযাদার ব্যক্তি যেহেতু অতিভোজন থেকে বিরত, অতিরিক্ত চর্বি ভক্ষণ থেকে বিরত, তাই শরীরের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মেদ রোযাদারের খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কমে যাবে এবং দেহ স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসবে। ১১-০৮-৯২ইং তারিখে দৈনিক মুক্ত বার্তায় (বাংলাদেশ প্রকাশিত) ডাঃ'এ,সি, সেলমন' মানুষকে সুস্থ থাকার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন, তার মধ্যে রোযাদারের পক্ষে অনায়াসে পালন করার মত উপদেশ বিদ্যমান। যেমন- (১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, (২) মাংস ও মসলা কম খাবেন, (৩) ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাবেন, (৪) অন্ত্র নিয়মিত খালি রাখুন, (৫) রাগ পরিহার করুণ, (৬) শান্ত ও পবিত্র থাকুন।

৩। উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশান)ঃ অধিক ভক্ষণ, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ ইত্যাদি কারণে চর্বি জমে রক্তবাহী নালিকাগুলি সরু হয়ে যায়। ফলে ভেইন (শিরা) ও আর্টারীতে রক্তচাপ বেড়ে যায়; একে বলে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশান। চর্বি জমে সূক্ষ্ম আর্টারীগুলো আরো সরু হয়, ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তা থেকে হার্ট, ব্রেইন, কিডনি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সৃষ্টি হয় হার্টের করোনারী থ্রোম্বসিস, মস্তিষ্কে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, কার্ডিয়াক এ্যাজমা, এমনটি হার্টফেইলুর। চোখের রক্তবাহী আর্টারী সরু হওয়ায় চোখের রেটিনায় নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। মস্তিষ্কে থ্রম্বোসিস হয়ে একচোখে দৃষ্টি কমে যাওয়া, মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যাওয়া, দেহের অর্ধাংশ অবশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষ্যণ প্রকাশ পায়। অত্যধিক রক্তচাপের কারণে হ'তে পারে C.V.A (কাডিও ভ্যাসকুলার অ্যাকসিডেন্ট), তাতে হ'তে পারে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা কয়েকদিন পর্যন্ত বেহুঁশ এর পর মৃত্যু। রোযাদার ব্যক্তি ছিয়ামের আগুনে তার শরীরের চর্বি কমিয়ে আনতে পারে। নিয়মিত তেলাওয়াত ও ইবাদতের ফলে হাইপারটেনশান ও তা থেকে সৃষ্ট নানাবিধ জটিল উপসর্গ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে পারে।

৪. *মডার্ণ মেডিসিন।*

৫. *ডেভিড সত্তাঃ প্রিন্সিপাল অব মেডিসিন।*

http://islaminonesite.wordpress.com

৪। পেপটিক আলসারঃ অনেক কারণে পেপটিক আলসার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো ঘন ঘন অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়া, বেশী চা পান, ধূমপান ও মদ্যপান। এসব কারণে পাকস্থলী থেকে অধিক পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCL) নিঃসৃত হয়, তা থেকে সৃষ্টি হয় পেপাটিক আলসার। পেপটিক আলসারের উপসর্গ স্বরূপ নাড়ী ফুটো হয়ে যেতে পারে, রক্তবমন, কালো পায়খানা, নাড়ী সরু হওয়া, আলসার, ক্যান্সার এর মতো মারাত্মক ব্যধি হওয়াও বিচিত্র নয়। রোযাদার ব্যক্তি ঘন ঘন অল্প পরিমাণে খাবার সুযোগ পান না। চা পান, ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি থেকে বিরত থাকেন। ফলে পেপটিক আলসার হবার সুযোগ বহুলাংশে কমে যায়। শরীর সুস্থ রাখতে হ'লে পাকস্থলীকে সুস্থ রাখতে হবে। আর পাকস্থলীকে সুস্থ রাখার একমাত্র উপায় রোযার মাধ্যমে পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া।

৫। টেকিকার্ডিয়াঃ অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতা (Anxity), মদ্যপান, চা, কফি পান ইত্যাদি থেকে এ রোগ সৃষ্টি হয়। টেকিকার্ডিয়া হার্টের এক মারাত্মক অবস্থা। হার্টবিট মিনিটে ৯০ বা তারও উর্ধ্বে চলে যায় (স্বাভাবিক প্রতি মিনিটে ৭২), হার্টের ব্যথা শুরু হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, রোগী অজ্ঞান হ'তে পারে। সম্ভাবনা দেখা দেয় হার্টফেইলুর করবার।

রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধ্যানে রত পবিত্র আত্মায় থাকেন, তাই থাকেন উদ্বীগ্নতাহীন। ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি করার প্রশ্নই ওঠে না। আর তাই রোযাদার মু'মিন ব্যক্তি থাকেন টেকিকার্ডিয়া থেকে বহুলাংশে নিরাপদ।

৬। বহুমূত্র (ডায়াবেটিস)ঃ অতিভোজন, অধিক চিনি জাতীয় খাবার খাওয়া ইত্যাদি কারণে এবং শরীরে প্যানক্রিয়াসের ইনসুলিন -এর স্বল্পতাহেতু রক্তে চিনির ভাগ বেড়ে যায়, ফলে সৃষ্টি হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ। লক্ষণ স্বরূপ রোগীর ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, তৃষ্ণা, কৃশতা, দূর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয়। উপসর্গ স্বরূপ হ'তে পারে গ্লাইসেমিক কোমা, হাইপো গ্লাইসেমিক শক ইত্যাদি মরণ ব্যাধি। ব্যাধির ১নং চিকিৎসাই হলো খাদ্য নিয়ন্ত্রণ।

তাই রোযাদার ব্যক্তির রোযার মাধ্যমেই চিকিৎসা হয়ে যায় ডায়াবেটিস নামক কঠিন ব্যাধির। রোযার মাধ্যমে রক্তে চিনির ভাগ কমে যায় ক্ষারের ভাগ বৃদ্ধি পায়।

৭। এইড্‌স্ (AIDS)ঃ Acuired Immune Deficiency of Syndrome (AIDS) এইড্‌স্ হচ্ছে মানুষের এক দুঃখজনক ও ভয়াবহ অবস্থা যা এইচ, আই, ভি (HIV) নামক ভাইরাসের (জীবাণু) মাধ্যমে ঘটে। এই ভাইরাস ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির অন্যান্য রোগ-জীবাণুর মাধ্যমে সহজেই আক্রান্ত হবার ভয় থাকে। এইড্‌স্ প্রাথমিকভাবে একটি যৌন রোগ। যদিও ইহা অন্য উপায়েও ঘটতে পারে। এ রোগের এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বর্তমানে প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমেই এইচ, আই, ভি সংক্রমণ প্রতিহত করা যায়। আর ধর্মীয় অনুশাসন এ রোগ থেকে বাঁচার এক বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা।

রোযা যৌন আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করার মহৌষধ। যারা সময়মত বিয়ে করতে অক্ষম ইসলাম তাদের যৌনক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রোযা রাখার নির্দেশ দেয়। ফলে রোযা অবৈধ যৌন সংসর্গের পথ রুদ্ধ করে এইড্‌স্ এর কবল থেকে রক্ষা করে।[৬]

রোযার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপকারিতার ব্যাখ্যা ইসলাম-অজ্ঞ ব্যক্তিদের সামনে ইসলামের যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরে। এ পর্যায়ে তাই মহান বিজ্ঞানী আল্লাহ্ প্রদত্ত রোযাব্রত সম্পর্কিত তিন জন অমুসলিম বিশ্ব বরণ্যে ব্যক্তিত্বের মন্তব্য তুলে ধরছি।

ডাঃ এমারসন বলেছেন-

রোযা হ'ল অনশনের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ এমনি একটি সুন্দর এবং খাঁটি ব্যবস্থা যা কেবল ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই একচেটিয়া পালন করে থাকেন। কেননা, এ হচ্ছে মানব কল্যাণ আর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য আল্লাহ্‌র কঠোর নির্দেশ। যার অমান্য মানে খাঁটি ধর্মের অস্বীকার করা। এবং অকল্যাণ আর অমঙ্গলকে স্বেচ্ছায় ডেকে আনা। কল্যাণ-মঙ্গল যেমন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কল্যাণ-মঙ্গল, তেমনি অকল্যাণ- অমঙ্গল স্বাস্থ্যের জন্য অকল্যাণ-অমঙ্গল। এ কথা জ্ঞানী মাত্রই জ্ঞাত। তাই বলি, যদি কারো স্বাস্থ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে অনশনের প্রয়োজন মুহূর্ত এসে দেখা দেয়, তখন যেন সে সম্পুর্ণ ইসলামী নির্দেশমত রোযাব্রত পালন করে যায়।

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর কাশ্মিরী বলেছেন-

রোযা যা ইসলামের নির্দেশ, এ ব্রত হচ্ছে পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত ব্রত থেকে শ্রেষ্ঠ। অতএব, আমার মন্তব্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাকী সব নিকৃষ্ট। এজন্য আমি নিশ্চয়ই হয়তো বহুজনের বিরাগভাজন। উচিতে বিরাগভাজন হওয়া মানেই অন্তরের কিন্তু অশ্রদ্ধার পাত্র নই- এ কথাও নিঃসন্দেহে হলপ খেয়ে বলা যেতে পারে। রোযাতে কোন দোষ-ত্রুটি আছে বলে আমার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পড়েনি। প্রত্যেকটি ধর্মেরই কঠোর আদেশ আছে, অন্যায়কে বর্জন করে ন্যায়কে আঁকড়ে ধরতে। আমি আমার স্ব-জাতি ভাই-বোনদের আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছি- জানাচ্ছি; এবং জানাবো-- উপবাস ব্রত যদি পালনই করতে হয় তাহ'লে তারা যেন ঠিক ইসলামী নিয়ম-পদ্ধতিতে পালন করে যায়।

৬.[১,২,৩,৪,৫,৬, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ১৫-২১ জানুয়ারী ১৯৯৭ইং পৃঃ ৯-১০, এর ডাঃ সাইদ মাহমুদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোযা শীর্ষক প্রবন্ধের আলোকে লিখিত।]

http://islaminonesite.wordpress.com

মিঃ গান্ধী বলেছেন-

পবিত্র রামাযান মাসের রোযাকে মুসলমানেরা যে নিয়মে পালন করে যান, সত্যিই উপবাস ব্রতের এ নিয়ম অতি উত্তম। কখনো কখনো আমি মনের তাকীদে নিজেও এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকি। যদিও আমি একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ। আমিও ঠিক রোযার মতই নিজের ওপর সঠিক পরীক্ষা করে যাই- যেমন, প্রভাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি কোন দ্রব্যই পানাহার করিনে। পবিত্র ইসলাম ধর্ম মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়িয়ে যেতে এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে রামাযানের এ রোযা পালন করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সত্যি বলতে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির এ কথার ঘোষক হিসেবে লজ্জা করা চাইনে যে, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে রোযার অনুসরণ করলে অসংখ্য আধ্যাত্মিক সুফল পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়- পরমাত্মার সাথে যোগাযোগটাও যথেষ্ট নিকটতম অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ হয়। অধিকাংশ সময়েই আমার উপবাস ব্রতের অভ্যাস রয়েছে বলেই আমি মুসলমানদের পবিত্র রোযা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরছি। খারাপ সে খারাপই, ভালো সে ভালোই; তা সে যে ধর্মেই হোক। ভালো-মন্দের যাচাই ও বিচার -এর অধিকার সবারই রয়েছে।[৭]

আলোচ্য লেখনীর মাধ্যমে আশা করা যায় পূর্ণ মুত্তাক্বীরও দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর স্বচ্ছ হবে এবং যুগ চাহিদার ডামাডোলের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা মুসলিম আমরাই 'আশরাফুল মাখলুক' তা যথাযথ প্রমাণ হবে।

পরিশেষে সময়ের অবসরে মুমিনের চিন্তার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে তুলে ধরা হ'ল, সূরা 'আল-ইনফিতার' থেকে প্রথম এগারোটি ক্ষুদ্র আয়াত -

(১) আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। (২) যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্ত হবে, (৩) সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে এবং (৪) যখন কবর উন্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জানবে যে, সে কি করেছে ও কি করেনি। (৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন সুসামঞ্জস্য করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তার ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন, (৯) বিভ্রান্তির কিছুই নেই তোমরাই দ্বীনকে প্রত্যাখান করে থাকো। (১০) অবশ্যই আছে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক (১১) সম্মানিত লিপিকার বৃন্দ। [আল ইনফিতার ১-১১)

'মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সারাটি মাস ছিয়াম ব্রত পালনের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি দান করুন- আমীন।'

৭.[সংগৃহীতঃ অগ্রপথিক' জানুয়ারী ১৯৯৭ইং, প্রবন্ধঃ রোযা সম্পর্কে অমুসলিম গবেষক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত।]

ছাহাবা চরিত

হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)

-আখ্তারুল আমান

আলী (রাঃ) ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং খেলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলীফা। তিনি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর জামাতা ছিলেন। নবী নন্দিনী ফাতেমার (রাঃ) সাথে তাঁর শুভ বিবাহ হয়েছিল। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর নবুঅত প্রাপ্তির পর বালকদের মধ্য থেকে যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনিই হ'লেন হযরত আলী (রাঃ)। বহুবিধ গুণের সমাবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বে ঘটেছিল। তিনি অত্যন্ত সাহসী বীর ছিলেন। তাঁর বিরত্বের এক একটি ঘটনা রূপকথার মত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা হিসাবেও সুপরিচিত। কাব্য রচনায়ও তার বেশ দখল ছিল। তিনি অত্যন্ত আবেদ ও জাহেদ ছিলেন। তাঁর মহত্ব ও ফযীলতে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব সহ আরো বিভিন্ন কিতাবে তাঁর রেওয়ায়াতকৃত হাদীছসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে সর্বমোট হাদীছ বর্ণনা করেছেন ৫৮৬টি। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার তিন পুত্র-হাসান, হুসাইন, মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাহ এবং ইবনু মাসঊদ, ইবনু ওমার, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবাইর, আবু মূসা, আবু সাঈদ, যায়দ বিন আরক্বাম, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আবু উমামাহ্, আবু হোরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম আজমাঈন)। প্রমূখগণ[১]

নাম ও জন্মঃ নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, আবু তুরাব, আবুস্ সাবত্বীন। তার প্রথম পুত্রের নাম হাসান, তাই তাঁকে আবুল হাসান বলা হ'ত। আবু তুরাব (মাটির বাপ) তাঁর এই উপনামটি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজেই রেখেছিলেন।

বংশ পরিচয়ঃ আলী (রাঃ) -এর পিতার নাম আবু ত্বালেব। তবে ইহা তার প্রকৃত নাম নয় বরং উপনাম। তার প্রকৃত নাম হ'ল আব্দু মানাফ। আলী (রাঃ) -এর মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিন্তু আসাদ। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপ- আলী বিন আবু ত্বালেব (আবদু মানাফ) বিন আব্দুল মুত্তালিব (শাইবা) বিন হাশেম (আম্র) বিন আব্দু মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়দ) বিন কেলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুআই বিন গালেব বিন ফিহ্র বিন মালেক বিন নাযর বিন কেনানাহ্[২]।

১.তারীখুল খোলাফা ১৫৭।
২. তারীখুল খোলাফা ১৫৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রাথমিক জীবনঃ আলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) -এর সান্নিদ্ধ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন বাল্যকাল হ'তেই। কারণ তিনি বাল্যকাল হ'তে নবী (ছাঃ) -এর স্নেহময়ী ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) -এর চাচা আবু তালিব বহু সন্তানের পিতা ছিলেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি অভাব-অনটনে দিনাতিপাত করতেন। এ দেখে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর পারিবারিক অভাব অনটন লাঘবের নিমিত্তে চাচা আব্বাসের সাথে পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হন। এক সময় তারা উভয়ে আবু তালিব এর কাছে এই মর্মে প্রস্তাব দেন যে, তার কিছু সন্তানকে লালন-পালনের জন্য তাদের কাছে দেয়া হোক। উত্তরে আবু তালেব বললেন, যাকে তোমাদের ইচ্ছা নিয়ে যাও। তবে (ছোট ছেলে) আকীলকে আমার কাছেই রাখ। তখন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আলী (রাঃ) কে নেওয়ার দায়িত্ব নিলেন এবং আব্বাস (রাঃ) নিলেন স্বীয় দায়িত্বে জাফরকে। এভাবেই আলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) -এর কাছে ছোট্টবেলা থেকে লালিত-পালিত হ'ত।[৩]

ইসলাম গ্রহণঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে আব্বাস, আনাস, যায়দ বিন আরক্বাম, সালমান ফারসী সহ একদল উলামার অভিমত অনুযায়ী তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। আবু ইয়ালা স্বীয় সনদে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার নবী হিসাবে প্রেরিত হন আর আমি ইসলাম গ্রহণ করি রোজ বুধবার'।[৪] সে সময় তার বয়স ছিল ১০ বছর। তবে কেউ ৮/৯ বছরের কথাও উল্লেখ করেছেন।[৫] তিনি বাল্য অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলেও দাওয়াতী কাজে তার ভূমিকা ছিল বয়জৈষ্ঠের মত। ইসলামের দাওয়াত দানে তিনি সর্বদা নিবেদিত প্রাণ থাকতেন। তার চিত্তাকর্ষক বক্তব্য শুনে বহু অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হত।

তার ফযীলত ও মহত্ব সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদীছঃ

আলী (রাঃ)-এর ফযীলতে হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ সহ আরো বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে বহু হাদীছ সংকলিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, আলীর (রাঃ) ফযীলতে যে পরিমাণ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে অন্য কারো জন্য ঐ পরিমান হাদীছ বর্ণিত হয় নাই।[৬] নিম্নে তার ফযীলত সংক্রান্ত কতিপয় হাদীছ আলোচিত হ'ল-

(১) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবুক যুদ্ধে যখন আলী (রাঃ) কে তার স্থলাভিসিক্ত করলেন, তখন তিনি (আলী) বলেছিলেন, আপনি কি আমাকে মহীলা ও শিশুদের সাথে পশ্চাদে রাখতে চাচ্ছেন? তখন নবী (ছাঃ) বললেন, (হে আলী!) তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকট ঐরূপ হবে যেরূপ হারূন (আঃ) মর্যাদার দিক দিয়ে মূসার (আঃ) নিকট ছিলেন? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে আর কোন নবী নাই।[৭]

(২) হযরত সাহ্ল বিন সা'দ(রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী (ছাঃ) বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে আমি ঝান্ডা প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ (খায়বার বাসীর উপর) বিজয় দান করবেন, যে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ) কে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তার রসূল (ছাঃ)ও তাকে ভালবাসেন। জনগণ রাত্রী যাপন করলেন এই নিয়ে পর্যালোচনা করতে করতে যে, তাদের মধ্যে কাকে উক্ত পতাকা দেওয়া হবে? অতঃপর সকাল হ'লে সকলে চলে গেলেন রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে। তাদের প্রত্যেকেরই এই আশা ছিল যে, তাকেই উহা দেয়া হবে। নবী (ছাঃ) বললেন, আলী বিন আবু ত্বালিব কোথায়? বলা হ'ল তার চোখে অসুখ। তখন তিনি বললেন, তার নিকটে লোক পাঠাও (তাকে ডেকে আনার জন্য)। তাকে নিয়ে আসা হ'ল। তখন রসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উভয় চোখে থুথু ফেললেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। ফলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন এমনভাবে যেন তার কাছে কোন ব্যাথাই ছিল না।[৮]

(৩) সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিম্নোক্ত আয়াতটি যখন নাযিল হ'ল- 'আমরা ডাকব আমাদের সন্তান ও তোমাদের সন্তানদেরকে' তখন নবী (ছাঃ) আহবান করলেন আলী, ফাতেমা ও হাসান, হুসাইনকে এবং তাদেরকে জমায়েত করে বললেনে, হে আল্লাহ! এরা হ'ল আমার পরিবার।[৯]

(৪) সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমার বাড়ীতে আগমন করলেন। আলী (রাঃ) কে বাড়ীতে না পেয়ে বললেন, তোমার চাচাতো ভাই কোথায়? তিনি (ফাতেমা) বললেন, আমার ও তার মধ্যে কিছু (কথা কাটাকাটি) হয়েছিল তাই তিনি আমার উপর রাগান্নিত হয়ে বেরিয়ে গেছেন। আমার কাছে শয়ন করেননি। তখন নবী (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখতো সে কোথায় আছে? লোকটি (খোঁজ খবর নিয়ে) ফিরে আসল এবং

---

৩. আত -তারীখুল ইসলামী ২৫১ পৃঃ।
৪. তারীখুল খোলাফা ১৫৬ পৃঃ।
৫. তারীখুল খোলাফাঃ ১৫৬ পৃঃ।
৬. হাকেম, তারীখুল খোলাফা ১৫৭

(৭) বুখারী, হাদীছ নং ১৬৯৮, মুসলিম, হা/১৬৩৯
(৮) বুখারী, মুসলিম, তারীখুল খোলাফা ১৫৮।
(৯) মুসলিম, তারীখুল খোলাফা ১৫৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! উনী মসজিদে (নববীতে) শুয়ে আছেন। রসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকটে আসলেন। তখন তিনি এমন অবস্থায় শুয়ে ছিলেন যে, তার চাদর খানা তার শরীরের একপার্শ হ'তে পড়ে যাওয়ায় তাতে মাটি লেগে গেছে। রসূলুল্লাহ (ছাঃ) উহা মুছতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন 'উঠ! হে মাটির বাপ! উঠ! হে মাটির বাপ'।[১০]

(৫) হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ সত্ত্বার কসম যিনি (দানা) বিজ সৃষ্টি করেছেন এবং আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয়ই নবী (ছাঃ) আমার নিকট অছীয়ত করেছেন, এই মর্মে যে, আমাকে মুমিনই শুধু ভালবাসবে এবং আমাকে মুনাফেকই শুধু খারাপ জানবে'।[১১]

(৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মুনাফিকদের চিনতে পারতাম আলী (রাঃ) কে তাদের নিকট মন্দ লাগার মাধ্যেমে।[১২] তাছাড়া তিনি ঐ ১০ জন ছাহাবীদের অন্যতম যাঁদের কে জান্নাতবাসী হওয়ার সু সংবাদ এই দুনিয়াতেই দেওয়া হয়েছিল।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণঃ

হযরত উছমানের (রাঃ) শাহাদত বরণের পর সমগ্র মুসলিম জাহানে চরম অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। হযরত উছমান (রাঃ) -এর খুনীরা তখনও মদীনাতেই অবস্থান করছিল। পরিস্থিতি প্রতিকুল দেখে ছাহাবীগণ খলীফা নির্বাচনের জন্য মনযোগী হন। সমগ্র মদীনাবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় হযরত আলীর (রাঃ) দিকে। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁরা অনুরোধ জানালেন তাঁকে। তিনি প্রথমে এতে অসম্মতি প্রকাশ করলেও পরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সম্মতি প্রকাশ করতঃ বললেন, যদি তোমরা তাই করতে চাও তাহ'লে মসজিদে (নববীতে) চল। কারণ আমার খিলাফতের বায়'আত গোপনে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না। ইহা অবশ্যই সকল মুসলিমদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদনের ভিত্তিতে হবে।[১৩] এতদশ্রবনে মুহাজির ও আনসার সকলে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাতে খেলাফতের বায়'আত করলেন। পরে সমস্ত জনতা তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। এভাবে হযরত আলী (রাঃ) ৩৫ হিজরীর ২৫ শে যিলহজ্জ, জুম'আর দিনে খেলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হিসাবে বরিত হন।[১৪]

খেলাফতের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) -এর পদাংক অনুসরণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং তৎকালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনায় কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন সাধনে বিন্দুমাত্র সম্মত ছিলেন না। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) সমগ্র হিজায হ'তে নির্বাসিত যেসব ইয়াহূদীকে 'নাজরান' নামক স্থানে পুনর্বাসিত করেছিলেন।

তারা হযরত আলীর (রাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত কাতর ও বিনীত কণ্ঠে তাদের প্রাক্তন বসতিতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এতে স্পষ্ট ভাষায় আস্বীকৃতি জানায়ে বললেন, 'হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষা অধিক সু-বিবেচক, বিচক্ষণ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আর কে হ'তে পারে?[১৫] হযরত আলী (রাঃ) খেলাফত লাভের পর পরই দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনঃ

(১) উছমান (রাঃ) -এর নিয়োগকৃত সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অপসারণ ও তাদের স্থলে নতুন কর্মকর্তা নিযুক্ত করণ।

(২) বায়তুল মাল হ'তে যে সব সম্পদ উছমান (রাঃ) -এর আত্মীয়স্বজন ভোগ করত, তা পুনরায় বায়তুল মালে ফিরিয়ে নেওয়া।[১৬]

হযরত আলীর (রাঃ) এই দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ বনী উমাইয়ার ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারাই মূলতঃ ঐ দু'টি পদক্ষেপের আউতায় পড়েছিল।

যা হোক আলী (রাঃ) তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত প্রদেশে নতুন শাসক নিযুক্ত করেন ও তাদের মাধ্যমে ঐ সব প্রদেশের জনগণ থেকে তাঁর বায়'আত নিতে শুরু করেন। 'ইয়ামান' এলাকায় শাসক নিযুক্ত করেন পূর্বের শাসক 'ইয়ালার' পরিবর্তে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে। মক্কার শাসক নিযুক্ত করেন খালেদ বিন আস কে। কিন্তু তাকে মক্কাবাসী ফিরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে কামাম বিন আব্বাসকে, শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং পরিস্থিতি অনুকুলে আসে। অতঃপর মক্কাবাসী হ'তে আলী (রাঃ) -এর খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করা হয়। শরয়ী বিধান সেখানে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হ'তে থাকে। মিসরে কায়স বিন উবাদাহকে শাসক নিযুক্ত করা হয় পূর্ব শাসক আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ -এর স্থলে।

মিসরবাসী থেকে আলী (রাঃ) -এর খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করা সম্পন্ন হয়, তবে কিছু মিসরবাসী এর ব্যতিক্রম থাকে। কুফায় পূর্ব শাসক আবু মূসা আশ'আরীকেই বহাল রাখা হয়।

---

১০. মুখতাসার সহীহ মুসলিম হা/ ১৬৪১।
১১. মুসলিম. তারীখুল খোলাফা ১৫৯।
১২. সহীহুত তিরমিযী লিল আলবানী।
১৩. মুখতাসার সীরাহঃ ৩৬০. আত -তারীখুল ইসলামী ২৫৮।
১৪. আত্-তারীখুল ইসলামী ২৫৯।
১৫. খিলাফতে রাশেদা ১৬৬।
১৬. আল আশারাহ আল-মুবাশ শারুনা বিল জান্নাহ ১০৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনিও নতুন খলীফার জন্য কুফাবাসী হ'তে বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন করেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাকে পদচ্যুত করে অন্যকে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করা হয়।

উষ্ট্রের যুদ্ধঃ (জঙ্গে জামাল)

আলী (রাঃ) তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত মুতাবিক অন্যান্য প্রদেশের মত বসরা প্রদেশেও নতুন শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন উছমান বিন হুনাইফকে পূর্ব শাসক আমের -এর স্থলে। সে সময় বসরা নগরীতে বেশ মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। পরিস্থিতি এমনিতেই প্রতিকূল ছিল। ঠিক এই মূহূর্তে বসরায় পূর্ব শাসকসহ মক্কা হ'তে একটি বৃহৎ দলের বসরায় আগমন ঘটে। তারা খলীফা বিরোধী ছিল। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন ত্বালহা, যুবাইর ও উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাযিল্লাহু আনহুম) প্রমূখগণ।

তালহা, যুবাইরও খলীফার হাতে মদীনায় বায়'আত করেছিলেন। তবে এটা তাঁদের সেচ্ছায় বায়'আত ছিল না। বরং তাঁদের থেকে এই বায়'আত বলপূর্বক নেওয়া হয়েছিল।[১৭] ফলে তারা খলীফার নির্দেশের তওয়াক্কা না করে মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। আয়েশা (রাঃ) হজ্জ আদায় করতঃ পুনরায় মদীনায় যাচ্ছিলেন। পথে উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে উছমান (রাঃ) -এর শাহাদতের মর্মান্তিক ঘটনা তাদের মুখে শুনতে পান। তিনি আরো অবগত হন যে, নতুন খলীফা আলী (রাঃ) এখনও উছমান হত্যাকারীদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

তাই তিনি আলী (রাঃ) -এর প্রতি রেগে যান এবং মদীনা যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় তাঁদের সাথে মক্কা ফেরৎ আসেন। তিনি হযরত উছমান (রাঃ) -এর হত্যাকারীদের হ'তে কেসাস গ্রহণের জোরালো দাবী জানান। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মক্কানগরী আলী (রাঃ) -এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে চলে আসলে আলী বিরোধী বিদ্রোহী ঐক্যজোট আর সেখানে না থেকে বসরার দিকে রওয়ানা হয়। আয়েশাও (রাঃ) তাদের সাথে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। বসরার গভর্ণর জানতে পেরে তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। তবে তিনি তাঁদের হাতে পরাজিত হয়। তাঁরা তাঁকে পরাজিত করে বসরা হ'তে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন, ফলে বসরা নগরী তাঁদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। এ সময় তাঁরা উছমান (রাঃ) -এর হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিল, ঐ নগরীতে তাদেরকে চিহ্নিত করে হত্যা করতে শুরু করেন। এতে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি শান্ত করার লক্ষ্যে আলী (রাঃ) কা'কা বিন আমর কে পাঠালেন। তিনি খলীফা বিরোধীদের বুঝালেন যে, খলীফার ও উছমান (রাঃ) -এর হত্যাকারীদের বিচার করার সিদ্ধান্ত আছে। তবে পরিস্থিতি অনুকূলে নাই এ জন্য-ই তা বিলম্বিত করছেন। কাজেই এ নিয়ে আর মতভেদ না করে সমাধানে আসা ভালো। দেশে শান্তি ফিরলে তাদের বিচার করা হবে। তারা তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করলেন। এই প্রস্তাব ও তাদের সম্মতি আলী (রাঃ) জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন। শুরু হ'ল উভয়দলের মধ্যে শান্তি আলোচনা। বসরাবাসী আলী (রাঃ) কে তাদের নিকট আসার আমন্ত্রণ জানালে আলী (রাঃ) বসরার এক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করলেন। উভয় দলের মধ্যে শান্তির চুক্তি আবশ্যম্ভাবী দেখে উছমান হত্যাকারীরা তাদের ভবিষ্যত পরিণতির কথা আঁচ করে ফেলে যে, শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত হ'লে তাদেরকে অবশ্যই দণ্ডিত করা হবে। কাজেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিল যে, যেকোন উপায়ে উভয় দলকে শান্তির বদলে যুদ্ধে লাগাতে হবে। এই কুচক্রী মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল সেই আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইয়াহুদী।

তারা বাস্তবে ঘটালোও তাই। যখন উভয় দলে শান্তির কথা অব্যাহত রয়েছে ঠিক তখনই ঐ কুচক্রীমহল আয়েশার দলের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আসল রহস্য উপলব্ধি না করতে পেরে তাদেরকে আলীর সৈন্য ভেবে তারাও যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। শান্তিচুক্তির আর কোন পথ না দেখে আলী (রাঃ) রনাঙ্গনে সদল বলে নেমে যান। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। উষ্ট্রে সওয়ার হয়ে উক্ত যুদ্ধে আয়েশা (রাঃ) আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন বলে যুদ্ধটি 'জঙ্গে জামাল' বা 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।[১৮]

---

১৭. অর্থাৎ মদীনায় জনগণ তাদেরকে এই বায়'আতে বাধ্য করেছিলেন।

১৮. আয়েশা (রাঃ) আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হওয়ার পিছনে ঐতিহাসিকগণ সম্ভাব্য তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন-

১. মুনাফেকীন কর্তৃক আয়েশা (রাঃ) কে যেনার অপবাদ দেওয়া হ'লে নবী (ছাঃ) (যেহেতু তাঁর কাছে তখনও এ বিষয়ে কোন অহী আসেনি, গায়েবের খবরও জানতেন না) কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এজন্য আয়েশা (রাঃ) সর্ম্পকে সুধী জনের নিকট মন্তব্য জানতে চেয়েছিলেন। সকলের মন্তব্য সন্তোষজনক ছিল, তবে আলী (রাঃ) -এর মন্তব্য ছিল একটু ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আয়েশা ব্যতীত আরো বহু মহীলা রয়েছে---। তাঁর এই মন্তব্যটি আয়েশা (রাঃ)-এর অন্তকরণে বদ্ধমূল হয়ে যায়। যার ফলে তিনি তাঁর খেলাফতকে মেনে নিতে পারেননি।

২. তাঁর পিতার হাতে অর্থাৎ আবু বাক্করের (রাঃ) হাতে আলী (রাঃ) দীর্ঘদিন বায়'আত করেননি। বহুদিন পরে তাঁর হাতে বায়'আত করেছিলেন (মুসলিম)। এজন্যই আয়েশা (রাঃ) তাঁর খেলাফতকে মেনে নিতে পারেননি।

৩. ভাগ্নে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের দ্বারা হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রভাবিতা হয়েছিলেন। তাই আলী বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে এ কথা বুঝিয়েছিলেন যে, উছমানের হত্যাকারীদের আলী (রাঃ) বিচার করেন না এজন্যই যে, তাঁর (উছমানের) হত্যার ব্যাপারে

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ১৫ হাজার মুসলমান নিহত হয়। ইন্নালিল্লাহে---। এই যুদ্ধে আয়েশার (রাঃ) উটটি পরম্পরা তীর বিদ্ধের কারণে সজারুর মত হয়ে গিয়েছিল। আলীর (রাঃ) নির্দেশক্রমে উটটিকে নহর করা হয়, ফলে উটটি যমীনে লুটিয়ে পড়ে। আয়েশা (রাঃ) উটের হাউদাজেই ছিলেন। যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন আলী (রাঃ)। যুদ্ধ শেষে আলী (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাথে সুলভ আচরণ করেন। তাকে সসম্মানে স্বীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদ বিন আবু বাক্র-এর সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এভাবেই জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তি হয়। যুদ্ধের তিন দিন পর আলী (রাঃ) বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করেন ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে এবং তিনি কুফায় চলে যান ম'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে (আত-তারীখুল ইসলামী ২৬৩-২৭২; মুখতাসার সীরাহ ৬৩৩-৬৩৪; তারীখুল খোলাফা ১৬৩)।

সিফফীনের যুদ্ধঃ একের পর এক প্রতিটি প্রদেশ আলী (রাঃ) -এর নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। শুধুমাত্র শাম (সিরিয়া) প্রদেশ তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে থাকে। আর এই শাম প্রদেশের শাসক ছিলেন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)। আলী (রাঃ) জাবের বিন আব্দুল্লাহকে মু'আবিয়ার নিকট এই মর্মে পাঠালেন যে, অন্যান্য মুহাজির ও আনসারদের মত খলীফার হাতে তিনিও যেন বায়'আত করেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রাঃ) এতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ফলে আলী (রাঃ) সিরিয়া (শাম) -এর উদ্দেশ্যে ৭০ হাজার ইরাকী সৈন্য নিয়ে কুফা হ'তে রওয়ানা হ'লেন। মু'আবিয়াও (রাঃ) ৬০ হাজার সৈন্যসহ আলী (রাঃ) -এর মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসলেন। উভয়ে সমবেত হ'লেন সিফফীন নামক স্থানে। তখন ছিল মোহাররাম মাস।

তাই আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হ'ল না। মোহাররাম শেষে সফর মাস আসতেই শুরু হ'ল তুমুল যুদ্ধ। উভয় পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হ'ল। এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকলো অর্ধমাস পর্যন্ত। আলী (রাঃ) -এর বিজয় নিশ্চিত দেখে শামবাসী চালাকী করে বর্শার মাথায় কুরআন শরীফ উত্তোলন করে বলল, আমরা আর লড়াই চাইনা। এখন চাই এই কিতাবের ফায়সালা। আলী (রাঃ) তখন যুদ্ধ বিরতী দিলেন। উভয় দলের সিদ্ধান্তক্রমে দু'জনকে বিচারক নিযুক্ত করা হ'ল। তাঁরা হ'লেন আমর বিন আস (মুআবিয়ার পক্ষের বিচারক) ও আবু মূসা আশ'আরী (আলী (রাঃ) -এর পক্ষের বিচারক)। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে, উভয় বিচারক মিলে যা ফায়সালা দিবে তা তাঁরা মেনে নিবেন। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মু'আবিয়া শামে চলে গেলেন এবং আলী (রাঃ) কুফায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আলী (রাঃ) -এর জামা'আত হ'তে কিছু সৈন্য বেরিয়ে হারুরা নামক স্থানে চলে যায়। আলী (রাঃ) তাদেরকে নছীহত করলেও কোন কাজ হ'ল না। অবশেষে ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে পাঠালেন তাদেরকে সুপথে ফিরানোর জন্য। দীর্ঘ বিতর্কের পর তাদের বৃহৎ অংশ পুনরায় আলীর দলভূক্ত হয়ে যায়। বাকীগুলো নাহারওয়ান নামক স্থানে জমায়েত হয় এবং আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁকে কাফের ফৎওয়া দেয়। আলী (রাঃ) তাদের প্রায় সকলকে হত্যা করতে সক্ষম হন। মূলতঃ এই দলটিই ইসলামের ইতিহাসে খারেজী দল হিসাবে পরিচিত। যথাসময়ে উভয় বিচারক 'দাওমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে মিলিত হ'লেন। কিন্তু তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারলেন না বরং তাঁরা কোন ফায়সালা না দিয়েই ফিরে গেলেন। উভয় বিচারকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা উল্লেখ করেছেন তা মোটেই ঠিক নয়। কারণ আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এতো বোকা ও অদূরদর্শী ছিলেন না যে, তাঁকে নিয়ে এভাবে খেলা করা হবে। বরং তিনি একজন সম্মানিত ছাহাবী ছিলেন। তাঁকে ওমর (রাঃ) গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর খেলাফতকালে। আর ওমরের পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তিনি তাঁর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করবেন এমন গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে, যা দ্বারা গুনান্বিত করেছেন ঐতিহাসিকগণ আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) কে। আমর বিন আসও (রাঃ) ঐরূপ প্রতারক, ত্রুটিপূর্ণ দিন্দার, ওয়াদা ভঙ্গকারী ছিলেন না যে, ঐভাবে আলী (রাঃ) কে খলীফা পদ থেকে অপসারিত করে মু'আবিয়া (রাঃ) কে খলীফা পদে বহাল রাখবেন।[১৯]

আলীরও (রাঃ) মৌন সমর্থন রয়েছে। অথচ আলী (রাঃ) ছিলেন এই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ পূত পবিত্র। তিনি তাদের বিচার এজন্য করছিলেন না যে, সে সময় মুসলিম সমাজে চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। আভ্যন্তরিন অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূলে ছিল। তার ইচ্ছা ছিল পরিস্থিতি শান্ত হ'লে তাদের সুষ্ঠু বিচার করবেন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন যুবাইয়ের এই ভূমিকার নিন্দা করে তাকে বলেছিলেন, 'তোমরা মুমিনদের মাতা আয়েশা (রাঃ) কে ধোকা দিয়েছ, তোমরা নবীর সম্মান রক্ষা করনি, যেহেতু তোমরা তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যু ও তরবারীর যুদ্ধের জন্য ঘর থেকে বের করেছ। (আল ইকদুল ফারীদ ১/১১০ পৃঃ; আল-মাউসূ'আতুল ইসলামিইয়্যাহ ১/১৬১৮ পৃঃ; আল আশারাহ্ আল-মুবাশ্শারুনা বিল জান্নাহ্ ১১০-১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কারণগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো জানেন। তবে এ কারণগুলি আয়েশা (রাঃ) -এর খলীফা বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়ার কারণ হিসাবে পরিগণিত করা হ'লেও তাঁর আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণ ছিল অন্য। আর তা হ'ল উছমান (রাঃ) -এর হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্র। আল্লাহ্ আ'লাম।

১৯. আত -তারীখুল ইসলামী ২৭৪-২৭৭ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

এভাবেই সিফ্ফীন যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। শাম দেশ মু'আবিয়ার নিয়ন্ত্রনেই থেকে গেল। তিনি (আলী) তাঁর সাথে আবার যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করেছিল বিরত থাকতে।

বিচারক হিসাবে হযরত আলী (রাঃ)

ন্যায় বিচার করা একটি নৈতিক দায়িত্ব। কুরআন ও হাদীছে ন্যায় বিচার করার প্রতি বহু তাকীদ করা হয়েছে। এই ন্যায় বিচারে সবাই সমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে, আর তোমাদেরকে যেন উদ্বুদ্ধ (উত্তেজিত) না করে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা অন্যায় বিচার করার উপর, সুবিচার কর (দোস্ত- দুশমন সবার সাথে) ইহাই আল্লাহ্ ভীতির অধিক নিকটবর্তী' (সূরা মায়েদাহ ৮)। এ জন্যই হযরত আলী (রাঃ) সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতন থাকতেন। বিচারের ক্ষেত্রে দোস্ত দুশমন সবাই তাঁর নিকট সমান ছিল। বিচারকার্য পরিচালনা সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক বহু মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন আলী (রাঃ)। এ জন্য তিনি যেকোন বিষয়ে নির্ভুল ফায়সালা দান করতেন। ওমর (রাঃ) জটিল জটিল বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে ফায়সালা গ্রহণ করতেন। হযরত উছমান (রাঃ)ও তাই করতেন। কথিত আছে, কোন এক মহিলা বিবাহের ছয় মাস পর বাচ্চা প্রসব করলে উছমান (রাঃ) তার উপর যেনা-ব্যাভিচারের হদ্দ (শাস্তি) জারি করার নির্দেশ দেন। কারণ সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। আলী (রাঃ) জানতে পেরে বললেন, এই ফায়সালা চুড়ান্ত করা ভূল হয়েছে। কারণ একজন মহিলা বিবাহের ছয় মাস পরে স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করতে পারে। এ কথা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। যেমন- এরশাদ হয়েছে 'আর তাকে (শিশুকে) গর্ভ ধারণ করতে ও স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস'। 'তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে সম্পন্ন হয়'। তিনি বললেন, প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে সন্তানকে গর্ভধারণ ও স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে সম্পন্ন হয় এবং দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে তার স্তন্য ছাড়ানো দুই বছরে হয়। স্তন্য ছাড়ানোর মেয়াদ দুই বছর তথা ২৪ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্য ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এ থেকেই ইহা প্রতীয়মান হ'ল যে, গর্ভধারনের মেয়াদ (সর্বনিম্ন) ছয় মাসও হ'তে পারে। হযরত উছমান (রাঃ) তার যুক্তি-প্রমাণে পরিতুষ্ট হয়ে উক্ত দন্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নেন।[২০]

আরো কথিত আছে যে, আলী (রাঃ) -এর নিকট এক ব্যক্তি অন্য একজনকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়ে তার কাছে এই অভিযোগ করল যে, সে বলেছে যে, সে আমার মায়ের সাথে স্বপ্নে ব্যভিচার করেছে। আলী (রাঃ) তখন বললেন, ঠিক আছে তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং সূর্যের তাপে তাকে দাঁড় করতঃ তার ছায়াকে (যেনার হদ হিসাবে) ব্যাত্রাঘাত কর।[২১]

২০.আল-হিকমাহ; তাফসীরুল কুরতুবী; মা'আরেফুল কুরআন।
২১.তারীখুল খোলাফা ১৬৮।

তাঁর কিছু উপদেশ বাণীঃ

আলী (রাঃ) বলতেন, পাঁচটি উপদেশ তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করঃ-

(১) তোমাদের কেউ যেন স্বীয় গোনাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় না করে।

(২) তার প্রতিপালকের নিকটেই যেন কামনা করে।

(৩) যে জানে না সে যেন (কারো নিকট থেকে) জেনে নিতে লজ্জাবোধ না করে।

(৪) যে ব্যক্তি জানে না ঐ বিষয় সম্পর্কে, যে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সে যেন তখন আল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই অধিক জ্ঞানী) একথা বলতে লজ্জাবোধ না করে।

(৫) ধৈর্য ঈমানের এমন স্থানে রয়েছে যে স্থানে মাথা রয়েছে দেহ হ'তে। সুতরাং সবর (ধৈর্য) চলে গেলে ঈমান চলে যায় যেরূপভাবে মাথা চলে গেলে (নষ্ট হ'লে) দেহও চলে যায়, নষ্ট হয়ে যায়।[২২]

শাহাদত বরণঃ

মক্কায় কিছু সংখ্যক খারেজী জমায়েত হয় এবং তিন ব্যক্তিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁরা হলেনঃ (১) আলী (রাঃ) (২) মু'আবিয়া (রাঃ) (৩) আমর বিন আস্ (রাঃ)। তাদের (খারেজীদের) মতে এই তিন জনই কাফের। কারণ তাঁরা সিফ্ফীন যুদ্ধে বিচারক নির্ধারণ করার ফায়সালা মেনে নিয়ে ছিলেন। এটা তাদের নিকটে ছিল বড় অপরাধ। যাই হোক, খারেজীরা তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম আলী (রাঃ) কে হত্যা করার দায়িত্ব নেয়। বারাক বিন আব্দুল্লাহ মু'আবিয়াকে হত্যা করার দায়িত্ব নেয়। আমর বিন বাক্র আমর বিন আসকে হত্যা করার দায়িত্ব নেয়। এভাবে তারা দায়িত্ব বন্টন সম্পন্ন করে। তাদের উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তারিখ ছিল ৪০ হিজরীর রামাযান মাসের ১৭ তারিখ- ফজর নামাযের সময়। একই দিনে একই তারিখে ঐ তিন খারেজী উক্ত তিন জনকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। আলী (রাঃ) তখন কুফায় থাকতেন। অন্যান্ন দিনের মত ফজরের নামাযের জন্য মসজিদের দিকে রওয়ানা হন।

এমতাবস্থায় ওত পেতে থাকা সেই নরপশু আব্দুর রহমান বিন মুলজিম খারেজী তার বিষ মাখা তরবারি দিয়ে আলী (রাঃ) -এর মাথায় আঘাত হানে।

সঙ্গে সঙ্গে জনতা তাকে পাকড়াও করে ফেলে। আলী (রাঃ) বললেন, তাকে আপাতত বন্দী করে রাখ, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তা'হলে তোমরাও তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে। আর যদি আমি জীবনে বেঁচে যাই তা'হলে তার ব্যাপারটা আমার হাতেই থেকে যাবে। ঐ একই দিনে মু'আবিয়া (রাঃ) -এর উপর আঘাত হানে বারাক বিন আব্দুল্লাহ খারেজী, তবে তাঁর পশ্চাতে আঘাত লেগেছিল বলে জীবনে বেঁচে গিয়েছিলেন। আমর বিন আস সেদিন অসুস্থ থাকায় ঘর হ'তে বের হননি। তাঁর স্থলে মসজিদে ইমামতির জন্য পাঠিয়েছিলেন খারেজা বিন হুযাফাহ্কে। আমর বিন বাকর খারেজীর হাতে তিনি নিহত হন।

২২.তারীখুল খোলাফা ১৭৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত আলী (রাঃ) আহত অবস্থায় শনিবার পর্যন্ত জীবিত থাকেন এবং রবিবার দিবাগত রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহে-ওয়া ইন্না-ইলায়হে রাজেঊন)। এইভাবে হযরত আলী (রাঃ) ৪০ হিজরীর রামাযান মাসের ১৯ তারিখে শাহাদত বরণ করেন।[২৩]

তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন হাসান, হুসাইন ও আব্দুল্লাহ বিন জাফর। তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন হাসান (রাঃ)। তাঁকে কোথায় দাফন করা হয় তা নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। কারণ ঐতিহাসিক রেওয়ায়াত এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী। কোন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় তাঁকে কুফার রাজধানীতে দাফন করা হয়, অন্য রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়, তাঁকে 'নজফ' নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। আবার কোন রেওয়ায়াতে এই তথ্যও পাওয়া যায় যে; তাঁকে তাঁর পুত্র হাসান (রাঃ) মদীনায় স্থানান্তর করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আলী (রাঃ) -এর মৃত্যুর পর তার খুনীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল[২৪]।

উপসংহারঃ পূর্ব পত্রিকায় উছমান (রাঃ)-এর জীবনেতিহাস শেষে বলা হয়েছে ছাহাবীদের মর্যাদার কথা এবং তাঁদের সমালোচনা করা কতটুকু সঠিক। সুতরাং এখানে আর সে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করে এতটুকুই বলব যে, ছাহাবীদের দ্বারা যাই সংগঠিত হোক না কেন আমরা তাঁদের সমালোচনা করার অধিকার রাখি না। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের সে অধিকার দেননি। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাদের পরস্পরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় মূলে থেকেছে বিধর্মীদের ষড়যন্ত্র। কাজেই তাঁরা এসব ব্যাপারে মাযুর ছিলেন।

সুতরাং তাদের মধ্যে দূর্ভাগ্যক্রমে যেসব দ্বন্দ-সংঘাত হয়েছিল তা নিছক চর্চার উদ্দেশ্যে আলোচনা করা যাবে না। ইমাম হাসান বসরী (রাঃ) বলতেন, আমরা ছাহাবীদের মধ্যে দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় ছিলাম না, থাকলে হয়তো আমাদের হাতও সেসব অন্যায় রক্তপাতে রঞ্জিত হত। আল্লাহপাক যখন অনুগ্রহ করে আমাদের হাত রক্তাক্ত হ'তে দেননি সে মতে আমাদের উচিত হবে ঠোটে মুখে যেন সে রক্তের দাগ না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।[২৫]

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ছাহাবীদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথে সবাইকে পরিচালিত করুন- আমীন!!

---

২৩. আত্ তারীখুল ইসলামী ২৮২; তারীখুল খোলাফা ১৬৪।

২৪. মুখতাছারু সীরাতির রাসূল ৬৪০।

২৫. মাসিক মদীনা (নভেম্বর'৯৭ সংখ্যা)।

।। অনন্য উপহার ।।

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

সম্মানিত সুধী!

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক ইসলামী গ্রন্থ ও পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচারের জন্য দিনরাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের সামর্থবান দ্বীনদার ভাইদের অনেকে আমাদের মূল্যবান প্রকাশনা সমূহ ও অন্যান্য পুস্তকাদি খরিদ করে দেশের বিভিন্ন পাঠাগার ও বিদগ্ধ সুধী সমাজের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার কল্যাণময় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অত্র 'অনন্য উপহার' তারই একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। প্যাকেটের বর্তমান মূল্য ৪০০/টাকা মাত্র।

আল্লাহ্র ওয়াস্তে এক প্যাকেট 'অনন্য উপহার' খরিদ ও বিতরণ করে দ্বীনী দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে আপনিও হতে পারেন অশেষ ছওয়াবের অধিকারী। আপনার প্রদত্ত উপহার সমূহ পাঠ করে যদি একজন ভাই বা একটি বোন দ্বীনের সঠিক রাস্তা খুঁজে পান ও সেমতে আমল করেন, তবে ঐ ভাই ও বোনের সমস্ত নেকীর সমতুল্য নেকী আপনার আমলনামায় লেখা হবে ইনশাআল্লাহ। দুনিয়াতে এই 'অনন্য উপহার'-এর বিনিময়ে আখেরাতে আল্লাহ আপনাকে দিতে পারেন জান্নাতের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমাদের প্রকাশিত গবেষণাধর্মী মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকার (বার্ষিক চাঁদা ১১০.০০) এক বা একাধিক কপির বার্ষিক গ্রাহক হয়ে তা বিতরণের মাধ্যমেও আপনি অশেষ নেকী হাছিল করতে পারেন।

যোগাযোগ করুনঃ
সচিব, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ফোন (বাসা)ঃ ০৭২১-৭৭৩২৫৭

http://islaminonesite.wordpress.com

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

-আব্দুস সামাদ সালাফী

(১) এক লোক ব্যবসা করার জন্য বিদেশে গিয়েছেন। কিছুদিন পর তার স্ত্রী তাকে পত্রে জানান আমি তোমার উপর হারাম হয়ে গেছি এবং অন্যত্রে বিয়ে করেছি। এখন থেকে তোমাকে আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। প্রতি মাসে তুমি আমার ও আমার স্বামীর খরচের জন্য টাকা পাঠাবে এবং আমাদের উভয়ের খিদ্‌মতের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

প্রশ্ন হ'ল, স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম হ'ল কেন? এবং তার পরেও তার খরচ বহন করতে হবে কেন? ও খেদমত করতে হবে কেন?

(২) মনসুর আল জাহজামা বলেন, আমার এক প্রতিবেশী তোফায়লী ছিল (কোন লোককে কেও দাওয়াত করলে অন্য আর একজন ঐ লোকের সাথে গিয়ে খানা খেয়ে আসে তাকে তোফায়লী বলে)। সে দেখতে যেমন সুদর্শন ছিল বাচনভঙ্গিও তেমনি ভাল ছিল, অন্যদিকে কাপড়ও খুব উত্তম ধরণের পরত এবং দামি আতর ব্যবহার করত। আমাকে কেও দাওয়াত করলে সে পিছনে পিছনে গিয়ে খেয়ে আসত। আমার জন্য লোকে তাকে আদর যত্নও করত। আমি একদিন মনে মনে স্থির করলাম যে, ওকে একবার অপমান করতে হবে যেন ও আমার সাথে আর কোথাও না যায়। জাফর হাশেমী তাঁর ছেলের খাতনার অনুষ্ঠানে বেশ কিছু বড় লোকদেরকে দাওয়াত করলেন, তার সাথে আমাকেও। আমি ভাবলাম, আমি আজকে চুপে চুপে যাব যেন ও জানতে না পারে। কিন্তু বের হয়ে দেখি সে আগেই প্রস্তুত হয়ে আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। ও আমার সাথে সাথে গেল। কিছুক্ষণ পর খাবার আসনে আমরা সবাই খেতে বসলাম। সে যখন খাবার জন্য হাত বাড়াল, তখন আমি বললাম, আমি দোস্ত বিল যিয়াদ থেকে শুনেছি তিনি আবান বিন তারেক হ'তে তিনি নাফে হ'তে তিনি আব্দুল্লাহ বিন ওমর হ'তে। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি বিনা দাওয়াতে কারো বাড়ী খেতে যায় তাহ'লে সে চোর হয়ে প্রবেশ করে এবং লুটতরাজকারী হয়ে বের হয়। সে (তোফায়ল) বলল, জনাব নিজের ভুল সংশোধন করলেন না? একজন সরদার মানুষকে খাওয়াতে চান, আর আপনি নিজেতো খাবেন কিন্তু অন্য লোককে খেতে দিবেন না তার ফন্দি আঁটছেন। দোস্ত বিল যিয়াদ হ'তে হাদীছ বর্ণনা করতে আপনার একটু লজ্জাও হ'ল না যে, সে একজন যঈফ রাবী। আবার সে আবান বিন তারেক হ'তে বর্ণনা করছে অথচ সে মাতরুক অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য রাবী। এই হাদীছটি চিন্তা ভাবনা করে বলা প্রয়োজন ছিল; কারণ সারা বিশ্বের মুসলমান এর বিরোধী। আপনি জানেন ইসলামে চোরের জন্য হাত কাটা ও ডাকাতের জন্য ক্বাজীর ইচ্ছামত শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে। কিন্তু কেউ যদি কারো বাড়ীতে অনুমতি বা দাওয়াত ছাড়া খায়, তাহ'লে তার জন্য এধরণের কোন শাস্তির নিয়ম নেই। অন্যদিকে আপনি ঐ হাদীছটি ভুলে গেছেন, যা আসেম বর্ণনা করেছেন, ইবনে জুরায়েজ হ'তে তিনি জোবায়র থেকে তিনি জাবের থেকে যে, রাসুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, একজনের খাবার দুইজনের জন্য দুইজনের খাবার চারজনের জন্য আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। এই হাদীছটির সনদ ও মতন দু'টাই ছহীহ্। মনসুর বলেন, সে আমাকে একেবারে চুপ করিয়ে দিল। অন্যান্য দিন খাবার পর সে আমার পিছনে পিছনে আসত। কিন্তু আজ সে রাস্তার অন্যদিক দিয়ে চলতে চলতে বলতে লাগল যে, 'যে ব্যক্তি যুদ্ধে অবতরণ করার পরেও মনে করল যে তাকে যখম বা আঘাত লাগবে না, সে বাজে ধারণা করল'।

(৩) একজন আলেম বলেছেন যে, আমার একজন বন্ধু ছিল যে সাহিত্যিক ও বড়ই হুশিয়ার। সে একদিন বলল, দোস্ত আমার বাড়ীতে দাওয়াতে যেতে হবে, তিনি বললেন, ঠিক আছে। বেশ কিছু দিন চলে গেল সে দাওয়াত হয় না। সেজন্য উক্ত বন্ধু যখনই তার বাড়ীর সামনে দিয়ে যেত তখনই ঐ দোস্ত (আলেম) বলতেন, 'তুমি সত্যবাদি হও তো বল, সে ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? সে বন্ধু চুপ করে চলে যেত। যখন দাওয়াতের প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাড় হয়ে গিয়েছে এমন সময় উক্ত বন্ধু রাস্তা দিয়ে আবার যাচ্ছিল। তিনি তাঁর উক্ত প্রশ্নের পূণরাবৃত্তি করলেন। সে বন্ধু বলল, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে তারই দিকে চল।

ভর্তির তারিখ বৃদ্ধি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-এর প্রথম শ্রেণী হ'তে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির তারিখ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বর্ধিত সময়ানুযায়ী ভর্তির ফরম গ্রহণ ও জমা দানের শেষ সময় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী'৯৮

ভর্তি পরীক্ষাঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী'৯৮ সকাল ১০টায়।

অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬১৩৭৮

Contents

কবিতা

যালেমের যুলুম

সংকলনেঃ শিহাবুদ্দীন সুন্নী

একদা বাঘের গলে হাড় ফুটেছিল,
বিপদে পড়িয়া বাঘের মুখ শুকাইল।
কৌশল করিল পশু অনেক প্রকার,
বিষম কন্টক তবু না হইল উদ্ধার।
এত যে দুরন্ত জীব ব্যাঘ্র নাম ধরে,
যন্ত্রণায় পড়িয়া সেও আর্তনাদ করে।
যারে দেখে লুটাইয়া পড়ে তার পায়,
বলে ভায়া কৃপা করে বাঁচাও আমায়।
অস্থি খণ্ড তুলিয়া যদি রক্ষা কর প্রাণ,
মন মত পুরস্কার করিব প্রদান।
কিন্তু শটের বচনে কেহ রাস্তা না করিল,
লোভে পড়িয়া বোকা বক আপনা ভুলিল।
বলিল, ভয় কি বাপু তুলিয়া দিব হাড়,
হাঁ করিয়া শুইয়া পড় উঁচু করিয়া ঘাড়।
ব্যাঘ্র যেই ভূমি তলে করিল শয়ন
চক্ষু মুদে বিস্তারীল বিকট বদন।
বক বাহে চঞ্চু শুরে প্রবেশিয়া শির
কলেবলে অস্থি খন্ড করিল বাহির।
ব্যাঘ্র যেই সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল
সুযোগ দেখিয়া বক বলিতে লাগিল।
বহু কষ্টে কন্টক উদ্ধার করিলাম তোমার,
তুষ্ট কর ব্যাঘ্ররাজ দিয়ে পুরস্কার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেবা পালন না করে
নরক অনন্তকাল পঁচিয়া সে মরে।
ব্যাঘ্র বলে বক ভায়া তুমি বড় বোকা
বয়সে পালিত কিন্তু কার্যে কচি খোকা।
বিলে-ঝিলে চুনো পুঁটি ধরিয়া যে খায়,
রাজ উপহার নাকি তার শোভা পায়!
অতএব কি কইব তোমারে বিধি প্রতিশুল।
দেহ দিলা শুষ্কস্তম বুদ্ধি দিলা স্থুল।
এই যে বিশাল দন্ত বদনে আমার,
লৌহ শলা গাঁথা যেন কৃৎতান্তের দ্বার।
হেমায় পশিলে কারো না হয় নির্গম
তোমার তরে লঙ্ঘিনু সে অটল নিয়ম।
ভেবে দেখ ব্যাঘ্র মুখে মুণ্ড দিয়াছিলে
সেই মুন্ড নিয়া পুণঃ প্রাণে বাঁচিলে।
এর চেয়ে সৌভাগ্য আরো কিবা আছে
পুণরূপী পুরস্কার চাস মোর কাছে।
দুরূহ বর্বর বক জানিস্ নিশ্চিত
ঘাড় ভাঙ্গিয়া পুরস্কার দিব সমুচিত।
এই বলিয়া ব্যাঘ্র যেই করিল ভ্রুকটি
কুমারের চাক যেন ঘোরে চক্ষু দু'টি।
দন্ত কড়মরি শুনিয়া প্রাণ উড়িল
বিপাক দেখিয়া বক প্রস্থান করিল।

[কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আবেদন রইল -সম্পাদক]

তাহরীকের প্রতি

-এস, এম, আমজাদ হোসেন

আত-তাহরীক!
সালাম জানাই তোমায় লক্ষ সহস্রাধিক,
গতি হৌক তোমার দূর্বার নির্ভীক।
সত্যের বাণী দিকে দিকে তুমি কর হে প্রচার
আমাদের মত মূর্খ যারা পেয়ে যাক কিনার।
পীর ফকীরের ভূঁয়া মতবাদে ডুবেছে সমাজ ভ্রম অন্ধকারে
কেহ নাই হেথায় সরল সঠিক তথ্য জানাবারে।
আত-তাহরীক!
তোমার পূতঃপবিত্র আলো ছড়াতে থাক চারদিক,
মুসলিম সমাজ বেড়ে উঠুক আবার দিশা পেয়ে সার্বিক।
আল-কুরআনের মধুময় বাণী করে যাও প্রচার
ছহীহ হাদীছের আনজাম শুধু দিয়ে যাও বারবার।
হে দয়াময়!
তোমার কাছে এই দো'আ চাই সার্বক্ষণিক
শত বাধা টুটে বয়ে চলে যেন আত-তাহারীক।

এখন রামাযান তবুও!!

-মোঃ আবু আহসান, রাঃ বিঃ।

এখন পবিত্র মাস
অথচ! দিনের বেলায় হোটেল, রেস্তুরাঁয়
ক্যান্টিন, বেকারী, চা স্টল, সর্বত্র বেচা কেনা
চলছে সমানে যেমন আগে ছিল।
শুধু তাই না-
দিনের বেলায় সিগারেট জ্বলে লুকিয়ে মুসলমানের হাতে
চলে হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল-মিটিং পিকেটিং গাড়ী ভাংচুর
চলছে মিছিলের শ্লোগানে অশ্লীল বাক্য॥
এখন পবিত্র মাস-
আমাদের বিল্ডিং -এর পাশে
টিনের ছাদের উপর

http://islaminonesite.wordpress.com

ফেনসিডিলের বোতল জমা হয়
আগের তুলনায় একই পর্যায়ে।
আবার দেখেছি-
রাজনৈতিক নেতা আযান শুনে বক্তৃতা থামায়
অথচ! নামায পড়তে দেখলাম না তার,
রোযা নেই অথচ ইফতারে পটু; আজব কারবার।
তাছাড়া এ মাসে এক মুসলমান আর এক
মুসলমানকে মারতে দেখেছি বহু বার॥
শুধু তাই না-
এ মাসে অনেক ছাত্রের লাশ হওয়ার সংবাদ
শুনেছে, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশী পিতা-মাতা,
এ মাসেও আগের মত চুরি ডাকাতি, মুনাফাখোরি,
হত্যা, রাহাজানি, ব্যাভিচার, চাঁদাবাজি, চলছে অহরহ
এ মাসেও সূদ- ঘুষ- জুয়া- লটারী চলছে অবিরত।
এই সেই পবিত্র মাস-
যে মাসে সর্বোচ্চ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,
অথচ অনাহারে, অনাবৃতে পড়ে আছে অনেকে
বস্ত্রের অভাবে মানুষ মরছে প্রকাশ্যে
আত্মস্বার্থের দৃষ্টান্ত দেখা যায় অহরহ
এ মাসে ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো আর অন্যায়ের সমারোহ॥
শুধু তাই না-
সিনেমা, রেডিও, টিভি, পেপার- পত্রিকায়
চলছে অশ্লীল ছবি ও লেখা
যা অন্য মাস হ'তে কোন অংশে কম নয়
এ মাসেও ফ্যাশন শো আর 'থার্টি ফাষ্ট ডে' পালিত হয়।
অথচ-
এদেশে নাকি শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান
অশান্তির দাবানল জ্বলছে সর্বত্র
সমাজ থেকে শান্তি আজ পরাহত,
ঘৃণ্য অভিযান চলছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার
সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসু মন,কে করবে এর প্রতিকার?
স্বার্থের দ্বন্দ্ব আর নেতৃত্বের লালসায়
মুসলমান হয়েও ইসলামী মূল্যবোধকে সদা
পদদলিত করতে চায়,
অথচ- আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমান
আমাদের সংবিধান হওয়া উচিত ছিল হাদীছ ও কুরআন॥

আত- তাহরীক

-মাকছুদ আলী মুহাম্মাদী

আন্দোলন আর উদাত্ত আহবান,

তাকলীদের উচ্ছেদ আর সত্যের সন্ধান।

তাওহীদী কাফেলার অভিযান অবিরাম,

হক প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম।

রীতির আনুগত্যে, দাও এলাহী তাওফীক,

কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠায়, 'আত-তাহরীক'।

[এখানে 'রীতি' বলতে সুন্নাহ বুঝানো হয়েছে]

বাঁকা চাঁদ

-ইমামুদ্দীন (৮ম শ্রেণী)

উঠিল ভাসিয়া নীল গগণে বাঁকা চাঁদের হাসি,
এসো আমরা সবাই মিলিয়া চাঁদ দর্শনের দো'আ পড়ি।
এগারটি মাস পার হইয়া আসিল রামাযান,
আমরা সবাই মিলিয়া তার করিব সম্মান।
সুবেহ সাদিকের পর সাহারী, সূর্যাস্তের পর ইফতার,
এইভাবে একটি মাস কাটিবে সবার।
দিনে বিরত থাকিয়া রাত্রে করিব পান,
রোযা অবস্থায় আল্লাহর করিব গুণগান।
রোযার অবস্থায় আমরা কুকর্ম থেকে থাকিব বিরত,
পূর্ণ রোযা রাখিব মোরা ঈমানদারের মত।
রোযা রাখিলে মোদের স্মরণে আসিয়া যায়,
কিভাবে দুঃখী ভাইয়েরা দিবা-নিশি কাটায়।
দিনের বেলায় উপস থাকিয়া রাত্রে কর পান,
এরি নাম রোযা জানিয়া নাও হে মুসলমান।
রোযা রাখিলে শরীরের যাকাত আদায় হয়
রোযাদার বান্দাদের আল্লাহ থাকিবেন সহায়।
রোযার শেষের দশ রাত্রির বিজোড় রাত্রিগুলি,
জেগে জেগে, আল্লাহ্‌র করিব গুন-গান,
তাহলে হাযার মাসের সওয়াব দিবেন- প্রভু মহান্।
রোযা রাখার কষ্টটা আর কষ্ট নাহি হয়,
রোযার শেষে ঈদের কথা যখন মনে হয়।
রোযার শেষে নীল আকাশে বাঁকা চাঁদ ওঠে,
আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে,
খুশীর ঈদ, খুশীর ঈদ, গ্রামে ও গঞ্জে।

http://islaminonesite.wordpress.com

মহিলাদের পাতা

মুসলিম রমনী

মূলঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ সেলিম

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

মহিলা মুহাদ্দেছীন

হাদীছ সংকলনের অভিযানঃ

ইসলাম ধর্মের মূল উৎস পবিত্র কুরআন মজীদ ও রাসূল (ছাঃ) -এর সুন্নত। এই দুই ভিত্তির উপরে ইসলামী বিধানের সুমহান অট্টালিকা দন্ডায়মান। কুরআন মজীদ তো হুযুর (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায় সংগৃহীত হয়েছিল এবং হাফেযগণের অন্তরেও ইহা সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং কুরআনের শুধু বাস্তব ব্যাখ্যা ও সম্পাদনার সমন্বয় সাধন অর্থাৎ হাদীছের সংকলন কার্য বাকী ছিল। এই মহান কাজটি খলিফা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের নির্দেশে (৯৯-১০২ হিঃ) আরম্ভ হয়। হাদীছের সংকলন ও সমন্বয় সাধন করতে ছয় শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেছীন এজামের কঠোর পরিশ্রম ও দুঃসাধ্য চেষ্টায় এই সুদূর প্রসারী ও সম্মানিত কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল, যা মুসলিম জাতির জন্য খুবই গৌরবের বিষয়। প্রাপ্ত হাদীছের ক্রমাগত গতিধারায় পাঁচ লক্ষ বর্ণনাকারীর জীবনী সংগ্রহ এবং দুর্বল ও বলিষ্ঠ হাদীছের যাচাই-বাছাই করা কি নগন্য ব্যাপার? ইহা মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় ও ঐতিহাসিক কর্ম। জার্মান পন্ডিত স্প্রেঙ্গার মুসলমানদের এই ঐতিহাসিক কর্মের জন্য অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং এই মহতি কাজের জন্য প্রাণ খুলে প্রশংসা করেছেন।

শিক্ষা সফরঃ

কুরআন মজীদের সূরা কাহাফে উল্লেখ আছে যে হযরত মূসা (আঃ) জ্ঞান লাভের জন্য হযরত খিযির (আঃ) -এর সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) -এর আদেশ আছে যে, 'তোমরা বিদ্যা অর্জন কর, সে কারণে যদি চীন যেতে হয় তবে যাও'। এই নির্দেশ মুসলমানদের মধ্যে যে উপলব্ধি এনে দিয়েছিল, তাতে তাদের শিক্ষা সফরে যাওয়া আবশ্যকীয় ছিল। যে ব্যক্তিই জ্ঞান সঞ্চয়ে আগ্রহী সে বেরিয়ে পড়ত। তারা দেশান্তরে দূরদূরান্তে ও শহরে অবস্থানকারী আলেমদের নিকট গমন করে তাঁদের থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে উপকৃত হ'ত। যারা ভ্রমনে বের হ'ত না, তাদের ততটা সম্মান ও মর্যাদা দেখানো হ'ত না।

পুরুষেরা তো সহজেই ভ্রমণ করতে পারতো। কিন্তু মেয়েরাও এমন সাহসী ছিল যে, তারাও স্বেচ্ছায় ভ্রমণে বের হয়ে যেত। যদিও পর্দার বাধ্যবাধকতা ও মুহরাম সফর সঙ্গী নিয়ে ভ্রমণে বের হওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। কারণ তার সঙ্গে তার গৃহকর্তা বা মুহরাম সফর সঙ্গী থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ধরণের ও বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হ'ত। তাদের পর্দার পূর্ণ ব্যবস্থা ও আরাম-আয়েশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হ'ত। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা হ'ত। কেতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সম্মানিত মহিলাগণ তাদের পাঠ গ্রহণ করতেন ও পাঠ শ্রবণ করতেন এমন নির্দিষ্ট স্থানে বসে, যেখানে কোন পুরুষ থাকতো না। কুর্দভীন শহরের এমন বহু শিক্ষালয় ছিল, যেখানে মহিলারা বসে শিক্ষক ও মুহাদ্দেছীনের নিকট থেকে হাদীছ শুনতেন। শিক্ষকের একই পাঠ পুরুষ ও মহিলা উভয়েই শ্রবণ করত। কিন্তু উভয়ের মিশ্রণের সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ মাঝে পর্দা থাকত। ইসলামে দাসীদের পর্দার আবরণ শিথিল করেছে বিধায় দাসীদের জন্য মুখের উপর কোন নেকাব রাখার প্রয়োজন নেই। সে কারণে দাসীরা শিক্ষাক্ষেত্রে ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও এই সুবিধা থেকে ফায়দা হাছিল করেছে। তাঁরা নেকাববিহীন অবস্থায় শিক্ষাদান করতেন। অধিকন্তু তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।

ফাতেমা বিনতে আবু আব্দুল্লাহ জুরজানীঃ

তারীখে জুরজানে ইমাম সাহমী লিখেছেন যে, ফাতেমাকে তার পিতা আবু আহমদ বিন আদীর দরসের মজলিসে পৌঁছিয়ে দিতেন। সেখানে তিনি হাদীছ শ্রবণ করতেন, অতঃপর সেখান থেকে তার পিতাই তাকে বাড়ী নিয়ে আসতেন।

যয়নাব বিনতে বুরহানুদ্দীন উরুবিলীয়াঃ

এই মহিলা মক্কা মুকাররমায় জন্ম গ্রহণ করনে। প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। যখন তাঁর জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা প্রবল হ'ল, তখন তাঁর চাচার সঙ্গে তিনি শিক্ষা সফরে বের হলেন। তারা অনারব দেশগুলিতে ভ্রমণ করলেন এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

বিশ বৎসর পর মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসলেন।

জুলায়খা আল-ওয়ায়েযাহঃ

জুলায়খা আফগানিস্তানের গযনী শহরের বাশিন্দা ছিলেন। তিনি গযনী হ'তে হজব্রত পালনের জন্য মক্কা মুকাররমাতে গমন করেন। অতঃপর তিনি বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণের জন্য সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। পবিত্র হরম শরীফে বিদ্যার্থীদের উপস্থিতি মুহাদ্দেছীনে কেরামের জন্য খুবই আকর্ষণীয় ছিল। হজ্জ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত আলেম সেখানে আগমন করতেন। এ কারণে স্থানীয় ও বিদেশী আলেমদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ হ'ত। জুলায়খা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হরম শরীফে অবস্থান করেন। বিদ্যালাভ ও জ্ঞান সঞ্চয় শেষে তিনি কুরআন ও হাদীছের প্রচারণা ও প্রকাশনার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মহিলাদের সমাবেশে বক্তৃতা, ওয়ায ও নছীহত শুরু করেন। এ কারণে তিনি আল-ওয়ায়েযাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ বিন আলী লাখমিয়া ইশ্‌বিলীয়াঃ

এই মহিলা স্পেনের প্রসিদ্ধ নগর ইশবিলীয়ায় বসবাস করতেন। তিনি স্পেনের বিখ্যাত মুহাদ্দেছ আবু মুহাম্মাদ বাজী ইশ্‌বিলীর মজলিসে শিক্ষার্থীনী হিসাবে গমন করেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে একসাথে শায়খ -এর মজলিসে যেতেন। এ কারণে দু'জনই এক শায়খ হ'তে হাদীছ সমূহ বর্ণনা করেন।

শামসুয যোহা বিনতে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল জলিলঃ

এই মহিলা প্রথমে হাদীছের পাঠ শ্রবণ করতেন, কিন্তু পরবর্তীতে তার স্বভাব দার্শনিক চিন্তা ইলমে তাসাউফের দিকে ঝুকে পড়ে। এই কারণে তিনি শায়খুত তরীকত আবুন নাজীব সোহ্‌রাওয়ার্দীর নিকট তাছাউফের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বিদুষী, তাপসী ও পরহেযগার মহিলা ছিলেন।

হাদীছ শ্রবণের আগ্রহঃ হাদীছে শ্রবণের আগ্রহে পরুষের সাথে মহিলারাও অংশী ছিলেন। এ জন্য মেয়েদের অশেষ অসুবিধা ও দুর্ভোগ সহ্য করতে হ'ত। এই অবস্থার ধারাবাহিকায় ইমাম ইবনে জাওযী এক ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, ইমাম আবুল ওয়ালীদ হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আহমদ হারুন কোরেশী খোরাসানী ৩৪৯ হিজরীতে এক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর তার মা তাঁকে শুনিয়েছেনঃ

'যখন তুমি আমার গর্ভে কয়েক মাসের শিশু; আমি তোমার পিতার নিকট অনুমতি চাইলাম যে, আমি ইমাম আবু আব্বাস বিন হামজাহ মুহাদ্দেছের মজলিসে হাদীছ পাঠে অংশগ্রহণ করব। তিনি আমার প্রস্তাবে অনুমতি দান করেন। দশ দিন আমি তার মজলিশে অংশগ্রহণ করি, দশ দিনেই সেই মজলিস শেষ হয়ে গেল। ইমাম আব্বাস দাঁড়িয়ে মুনাজাত করেন এবং আল্লাহর নিকট এক পুত্র সন্তান দানের আবেদন করেন। সেই রাতে গৃহে ফিরে স্বপ্নে দেখলাম কোন এক ব্যক্তি বলছেন যে, তোমার ছেলে সন্তান হবে, এবং তোমার নানার বয়সের সমান জীবিত থাকবে।

এই সন্তানই পরবর্তীতে ইমাম আবুল ওয়ালীদ খোরাসানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি ৭২ বছর বয়সে ২৩৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হাদীছ শাস্ত্রের হাফেযাঃ

ইমাম আবু মুহাম্মাদ শিরাজুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন ওমরদানী জান্নাবীর (২৪৩ হিজরী) সন্তানাদির মধ্যে এক অন্ধ বালিকা ছিলেন। এই বালিকা সুকৌশলে হাদীছ সমূহ শিক্ষা লাভ করেন। সে হেফজ শক্তিতে এতই শক্তিমান হয়ে উঠে যে, শেষে হাদীছ শিক্ষাদান উপার্জনশীল মহিলা হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

[চলব]

"আবার এসেছে রামাযান"

-রোকেয়া বেগম, বগুড়া

আবার এসেছে মাহে রামাযান
সাথে নিয়ে আল্লাহ্‌র ফরমান।
হঁও মুসলিম সংযমী
বলেন আল্লাহ অন্তর্যামী।
আবার এসেছে মাহে রামাযান
করতে রহমত বিতান।
থেক না আর ঘুমিয়ে
চোখ মেল দেখ কত বরকত।
আবার এসেছে মাহে রামাযান
মুমিনের দিতে সন্ধান।
অফুরন্ত নেকীর উৎস
তাই, সংযমী হও বৎস।
আবার এসেছে মাহে রামাযান
মুত্তাকীদের হবে উত্থান
কাফের ফাসেকদের পতন
তাই, এ মাসকে করা চাই অধিক যতন।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

০ গত (ডিসেম্বর/৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত ধাঁধাঁ (শিক্ষা মূলক) ও মেধা পরীক্ষা যারা অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক বিষয়ের ৪টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছোঃ

০ রাজশাহীর হাতেম খাঁ থেকেঃ মোছাঃ জয়নাব, তামান্না ইয়াসমিন তাসনিমা ইয়াসমিন (রোজী), মোঃ নুর আলম, মোস্তাফিজুর রহমান।

***আল মারকাযুল ইসলামী আস্-সালাফী, নাওদাপাড়া থেকেঃ** আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আব্দুল হামিদ, আঃ সামাদ, আঃ মুকিত, মিনারুল ইসলাম, কাওসারুল বারী, আঃ আহাদ, আব্দুল্লাহেল কাফী, জিয়া, আহমাদ, আব্দুল আলীম, নুরুল। ইসলাম, জুয়েল, আবু সাঈদ, শহীদুল, আতীক, আঃ মাজেদ।

*** কাজীহাটা থেকে-** আব্দুল রহমান বিন আব্দুল ওয়াহেদ।

*** শেখপাড়া থেকেঃ** নাজনিন আরা, জান্নাতুন ফেরদৌস (বিউটি), হালিমা খানম, সাকিলা খানম, রেহেনা খানম, জেসমিন নাহার, মাহফুজা খাতুন, রেজিয়া খানম, মারুফা খানম, মোঃ শুআইব, জাকারিয়া, মামিনুল ইসলাম, সালাউদ্দিন (শামিম), মোঃ হারুন।

*** উপশহর (সপুরা) থেকেঃ** তাহেরা খাতুন, মুখতারা খাতুন (মুক্তা)

***নগরপাড়া থেকেঃ** সুফিয়া খাতুন, আলিয়া পারভিন, সারোয়ার হোসেন। সারমিন ফেরদৌস (নিতু), খালেদা খাতুন। শরিফা খাতুন, মমতা খাতুন, সীমা খাতুন, নিলুফার ফেরদৌস, মুসলিম খাতুন। সামাউন ইমাম সৈকত, আব্দুল্লাহ আল খালেদ, বুলবুল আহমেদ, তারিক বিন হাবিব।

*** ভালুকগাছী পাঁচানী পাড়া মাদ্রাসা থেকেঃ** মুমতাহিনা, মুত্তাহিরা, মুরতাজিনা, মাহফুজা, মাহবুবা আফরিন, হাছিবুল্লাহ্।

০ সাতক্ষীরা থেকেঃ হামিদা খাতুন, ঝর্না পারভীন, সেলিনা খাতুন।

সাতক্ষীরা কলারোয়া উত্তর ভাদিয়ালী থেকেঃ মোঃ আরিফুল, মোঃ আছাদুল, মিছ রোজিনা খাতুন, মিছ রুবিনা খাতুন।

***গাইবান্দা থেকেঃ** আঃ মাজেদ বিন জুবান আলী, মোঃ আবুবকর ছিদ্দীক বিন আমীরুল ইসলাম

০ জয়পুর হাট আরামনগর থেকেঃ নাফিযা আকতার (হ্যাপী), এস,এম মাশকীকুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল মোমিন, মোঃ মুসাব্বর আলী ও মোছাঃ মমতাজ বেগম (কালাই), ওমর ফারুক (মোলামগাড়ী হাট)।

০ রংপুর পীরগাছা থেকেঃ নূরুন্নাহার আতিক।

০ সিরাজগঞ্জ থেকেঃ আল হেলাল, আমিনুল ইসলাম, ফালগুনী সুলতান (দমদমা, উল্লাপাড়া)।

০ দিনাজপুর, ঘোড়াঘাট থেকেঃ মোছাঃ রাবেয়া খাতুন।

***গত (ডিসেম্বর/৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত শুধুমাত্র ধাঁধাঁ (শিক্ষামূলক) -এর যারা অন্ততঃপক্ষে ৪টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছোঃ**

০ রাজশাহীর হাতেম খাঁ থেকেঃ বাবুল আকতার, রফিকুল ইসলাম (বাবু), শামীমা সুলতানা (সুইটি), শারমিন আক্তার (রুপা), আরফিনা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, পারভিন আক্তার, রাকিব ইসলাম, জাহিদ, মেরুন আল মিনার, আসাদুর রহমান, মোঃ আবু সাইদ, মোঃ হাসান, মোঃ রাজিব, মোঃ আবু সায়েম, জাহিদুর রেজা , মুহাঃ নাহিদ, মুহাঃ জাহিদ হাসান, মুহাঃ মীর আলম, মুহাঃ অলিউর রহমান (রাসেল)।

জয়পুরহাট, চিনিকল রোড় থেকেঃ মাহফুজা খানম মিনা।

বগুড়া, উত্তর পালপাড়া থেকেঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান (বাবু)।

গাইবান্ধা পূর্ব বারকোনা থেকেঃ মোঃ আঃ মমেন (সুজন)।

০ গত (ডিসেম্বর/৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত ধাঁধাঁ (শিক্ষামূলক) -এর সঠিক উত্তরঃ

১। কলম ২। পেন্সিল ৩। বই ৪। মেঘ ৫। আসাম।

০ গত (ডিসেম্বর/ ৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত মেধা পরীক্ষা (রহস্য) এর সঠিক উত্তরঃ-

১। সময় ৩টা ১০ মিনিট। ২। ৭ বার, ৩। ভাগ্নে ও মামা।

৪। ১০ টাকা নোট ৫ খানা = ৫০ টাকা
৫ টাকার নোট ১১ খানা= ৫৫ টাকা
১ " " ৫ "= ৫ "
মোট ২১ খানা= ১১০ টাকা

৫। বাম দিকে থেকে ১ম হাফেজ সাহেব
" " " ২য় মাষ্টার "
" " " ৩য় মাওলানা "
" " " ৪র্থ মুহাদ্দিছ "

এ সংখ্যার ধাঁধাঁ (আরবী)ঃ

১। কুরআন-কিতাবে থাকি আমি কুদরাতেরও সাথে
হয় না মাখলুক আমায় ছাড়া বসি কলমেরও সাথে।

২। চার অক্ষরে নামটি তাঁহার আছে কুরআনেতে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে প্রশংসা হয় তাতে।
দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে সাহায্য হয় দেশে
তৃতীয় অক্ষর বাদ দিলে আরশে গিয়া বসে।

৩। মাসে আসে মাসে যায়, তিন অক্ষরে নামটি তার
দিনে যায়না রাতে যায়,ভাবো একবার।

৪। তিন অক্ষরে নাম তার এমন একটি শব্দ
দুইদিনের আনন্দে ভরা চলে গেলে স্তব্ধ।

৫। পাঁচ অক্ষরের শব্দটি কোন সূরার কোন আয়াতে আছে
কত হিজরীর কোন মাসে এর বিধান আসে ?

০ এ সংখ্যার মেধা পরীক্ষাঃ (কুরআন -এর সূরা ও আয়াত সংখ্যা অবলম্বনে)

১। মুত্তাকীদের জন্য রবে স্ফটিক পানি আর নির্মল দুধের নহর
আরও আছে সু স্বাদু মধু ও শরাবের নহর।
আরও আছে রকমারি ফলমূল এবং পালনকর্তার ক্ষমা
বলতে পার কি সোনামণি -এর প্রমাণ কোথায় আছে জমা?

২। সোনা আর মণি দ্বারা জান্নাত হবে অলংকৃত
রেশমি পোশাকের সাজে সজ্জিত কোথায় আছে প্রমাণিত?

৩। এমনি জান্নাত দিবেন প্রভু, আছে রেশমি কাপড় আর হেলান আসন
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বৃক্ষছায়া, ফলমূল আরও সব তাদের
ইচ্ছার অধীন ।

৪। মিথ্যা আর অহংকার দোযখের হাতিয়ার
সূচের ভিতর দিয়ে যেমন না যাবে উট তেমন জান্নাত হারাম
তার।

৫। কতজন ফেরেশতা আছে দোযখে পাহারাদার
অগ্নিদগ্ধে ঝলসাবে শরীর পাবে না কেউ নিস্তার।

বিঃদ্রঃ উত্তর দেয়ার সময় সূরার নাম ও আয়াত সংখ্যা লিখলেই যথেষ্ট হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণি

যয়নব খাতুন
৫ম শ্রেণী, খুলনা

ছোট্ট আমি পুষ্প কন্যা
ছোট্ট আমার দাবী,
তাহরীকটা কিনে নিতে
ভুলে যেওনা ভাবী।
সোনার মত অঙ্গ আমার
আমি কুসুম লতা,
সোনামণির মূল মন্ত্রে
মিষ্টি মিষ্টি কথা।
লাল টুক্ টুক্ ঠোঁট আমার
মনে ভরা সুখ
তাহরীকটা হাতে পেলে
ভুলি সব দুঃখ।

শিরক

আহমাদ আল কাইয়ুম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

শিরক করা মহাপাপ
শিরকের গুনাহ হয় না মাপ।
যদি তোমায় ফেলা হয় আগুনে
তবুও শিরক করনা জীবনে।
রাসূল বলেন শিরক করে যারা
আখিরাতে মুক্তি পাবেনা তারা।
হাদীছ- কুরআন পড়ি
পীর পূজা ছাড়ি
এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি।
শিরক মুক্ত জীবন গড়ি।

সাধ

আব্দুল্লাহ (৩য় শ্রেণী)

মনে বড় সাধ জাগে
বড় কবে হব,
ইসলামকে সবার ঘরে
পৌঁছে আমি দিব।
এই দুনিয়ায় অনেক মানুষ
খারাপ কাজে লিপ্ত,
দ্বীন ইসলামের আলো দিয়ে
করব তাদের মুক্ত।
মোদের নবী মার খেয়েছেন
সত্য পথে ডেকে
তাঁর আর্দশ আমরা সবে
মানব সব রেখে।

ভালবাসি

তাসনীমা ইয়াসমিন
রাজশাহী

ভালবাসি,
আল্লাহ্‌র হুকুম মানতে
কুরআন হাদীছ পড়তে
ভাল কাজ করতে
সৎ মানুষ হতে
সুন্দর জীবন গড়তে।
ভালবাসি-
সত্য কথা বলতে
নবীর পথে চলতে
চাঁদের আলো দেখতে
ফুলের বাগানে ঘুরতে
আহলে হাদীছ হতে।

আমার বড় সাধ

জান্নাতুল ফেরদৌস
হড়গ্রাম সেখপাড়া

আমার বড় সাধ জাগে
মানুষকে ভাল বাসতে।
আমার বড় সাধ আছে
কুরআন হাদীছ শিখতে।
আমার বড় ইচ্ছা করে
রাসূলের পথ ধরতে।
আমর বড় ভাল লাগে
আত-তাহরীক পড়তে।
আমার বড় খুশী লাগে
ধাঁধাঁর আনন্দ পেতে।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

শান্তি বাহিনীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

বিদ্রোহী শান্তি বাহিনীর সাথে গত ২ ডিসেম্বর অনেক জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে অবশেষে সরকার এক বিতর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে একচেটিয়া ভাবে উপজাতি নিয়ন্ত্রণাধীন স্বশাসিত একটি ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে, যাতে পার্বত্য জেলার ভূমি, অর্থনীতি, প্রশাসনের উপর সরকার নয়, স্ব-জাতীয়দের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, বঞ্চিত হবে বাঙ্গালীদের সাংবিধানিক অধিকার। দীর্ঘদিনের এই সংকট সমাধানের টানা এক যুগ প্রয়াস-পূর্তিতে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্যদের সকল অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে আনা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে পার্বত্য জেলা পরিষদের। ৪৫ দিনের মধ্যে সরকার ও বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণের দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের লবিতে সরকারের পক্ষে চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও জনসংহতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তুলারমা) স্বাক্ষর করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, তিন বাহিনীর প্রধানসহ বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' গঠিত হবে। প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় একজন উপজাতি আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবে। ২২ সদস্যের পরিষদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন উপজাতি জনগোষ্ঠী থেকে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় গঠিত হবে এবং মন্ত্রী হবেন উপ-জাতীয়দের মধ্য থেকে।

শান্তি বাহিনী'র সাথে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির ফলে দেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ডের উপর থেকে সরকার কার্যতঃ কর্তৃত্ব হারাতে যাচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের অনুমোদন ছাড়া সরকার পার্বত্য এলাকার কোন ভূমি অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর করতে পারবে না। ভূমিকরসহ সকল প্রকার কর ও টোল নির্ধারণ ও আদায় করবে আঞ্চলিক পরিষদ। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদের সকল প্রতিষ্ঠানের আইন, বিচার, প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ক কর্মকর্তার নিয়োগ, বদলী, বিচার, শাস্তি ইত্যাদি প্রদানের এখতিয়ার থাকবে।

এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (জাফর-মোয়াজ্জেম), জাগপা, ডেমোক্রেটিক লীগ, এনডিএ, পিএনপি সহ আরও অন্যান্য সংগঠন বিদ্রোহী শান্তি বাহিনীর সাথে চুক্তি বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে এবং দেশব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদ, বিক্ষোভ-মিছিল, হরতাল, অবরোধ প্রভৃতি অব্যহত রেখেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গঠন করা হয়। শান্তিবাহিনী ১৯৭৬ সাল থেকে থানা আক্রমণ, অস্ত্রলুট, ব্রীজ, কালভার্ট ও সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, বিত্তশালী ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তাদের অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যা শুরু করে। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত শান্তি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ১৭৩ জন আর্মি, ৯৬ জন বিডিআর, ২৩ জন আর্ম পুলিশ, ৪১ জন পুলিশ, ৭ জন আনসার ৩ জন ভিডিপি সহ মোট ৩৪৩ জন নিহত হয়েছেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ১০৬২ জন বাঙ্গালী নিহত হয়েছে। বাঙ্গালী অপহরণের সংখ্যা ৪৫২। ১৯৮৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫ বার সাধারণ ক্ষমার আওতায় ১১৯৮ জন সশস্ত্র ও ১৭৯৫ জন নিরস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

সুন্দরবন থেকে সুন্দরী গাছ উজাড় হতে চলেছে

খুলনা মহানগরীতে অবৈধভাবে সুন্দরী কাঠের রমরমা ব্যবসা চলছে। ফলে সুন্দর বনে সুন্দরী গাছ উজাড় হতে চলেছে। খুলনা মহানগরীর রূপসা থেকে লবণচরা পর্যন্ত কাঠের আড়তে এই কাঠের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবন থেকে চোরাইপথে বনের ছোট-বড় সুন্দরী গাছ কেটে এনে এসব কাঠের আড়তে অধিক দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

এসকল কাঠুরে ও বাওয়ালীরা গোলপাতা কাটার নামে বনের ভিতর প্রবেশ করে অবৈধভাবে সুন্দরী গাছ কেটে আনে। এসকল কাঠ রাতের বেলায় বিভিন্ন স' মিলে চেরাই করা হয় এবং পরে তা বিভিন্ন আড়তে রেখে বিক্রি করা হয়। আর এভাবেই প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে দেশের এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী গড়ে তুলছে টাকার পাহাড়।

পদ্মার পানি কমছে আর কৃষকের বুক ফাটছে

হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া পদ্মা-মহানন্দার পানি কমতে শুরু করেছে। পানি কমছে আর জেগে উঠছে পঁচা বীজতলা ও করল্লা-পটলের ক্ষেত। গত ২৮ ডিসেম্বর রাজশাহীর নিকট পদ্মার পানির উচ্চতা ছিল ১৩ দশমিক ২১ মিটার। গত কয়েকদিন পানি প্রায় তিন ফুট কমেছে।

এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করে অস্বাভাবিকভাবে পদ্মা ও মহানন্দায় পানি বৃদ্ধি পায়। এতে করে নদীর তীরবর্তী চরাঞ্চল ও নীচু হাজার হাজার একর জমির ফসল তলিয়ে যায়। বিনষ্ট হয় পটল, করল্লা, মশুরী, সরিষা ও বরো ধানের বীজতলা। জানা গেছে, এ মাসের গোড়ার দিকে ভারতে প্রবল বর্ষণে সেখানে প্লাবন দেখা দেয়। বাড়তি পানির চাপ কমাতে ফারক্কার গেট খুলে দিয়ে ওপারের পানি এপারে ঠেলে দেয়া হয়। ফলে হঠাৎ করে পদ্মা ও মহানন্দায় অস্বাভাবিকভাবে পানি বেড়ে যায়। ডুবে

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

যায় পদ্মা-মহানন্দার চরাঞ্চলে আবাদ করা রবিশস্যের ক্ষেত। বিগত ২২ বছরের রেকর্ডে ডিসেম্বর মাসে কখনও পানি বৃদ্ধি পায়নি। যদিও পানি বৃদ্ধিকে কোন কোন মহল ফারাক্কা চুক্তির সুফল বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। পদ্মায় পানি কমছে আর কৃষকের বুক ফাটছে। অতিকষ্ট করে চাষীরা চরের বালুমাটি চষে আবাদ করেছিল রবি ফসলের। অকালে পানি বৃদ্ধিতে সব শেষ হয়ে গেছে।

পানি নেমে যাচ্ছে আর জেগে উঠছে ডুবে যাওয়া ক্ষেত। ক্ষেতের পঁচা ফসল দেখে কৃষকেরা হাহাকার করছে। তাদের ধারণা ছিল না এ সময় পানি বড়াতে পারে। গত ২৮ ডিসেম্বর গোদাগাড়ী চরাঞ্চলে ঘুরে দেখা যায় কৃষকের আহাজারী। আধাড়িয়াদাহ গ্রামের প্রবীণ কৃষক তপন জানান, ওরা খরার সময় আমাদেরকে পানি না দিয়ে শুকিয়ে মারে। আবার এ সময় পনি ছেড়ে ফসল ডুবায়। এ সময় পানি ছেড়েছিল ওদের অসুবিধা এড়াতে আর আমাদের সর্বনাশ করতে।

'র' -এর মদদে জুমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও সন্তুলারমার জনসংহতি সমিতির মধ্যকার চুক্তি দেশকে নতুন বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে। এই চুক্তি অস্থির, অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে ডেকে এনেছে রক্তপাত, এবং হানাহানি। সৃষ্টি করেছে নতুন জটিলতার। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী, ১২ টি উপজাপিত ও দেশপ্রেমিক জনতা এই চুক্তিকে বৈষম্যমূলক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংবিধান, মানবাধিকার বিরোধী ও দেশ বিভক্তির কালো চুক্তি হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতিমধ্যেই পার্বত্য বাঙ্গালীরা অধিকার আদায়ের জন্য এই চুক্তি বাতিলের দাবীতে আন্দোলনে নেমেছে। অন্যদিকে ভারতীয় গোয়োন্দা সংস্থা 'র' (RAW)। এই চুক্তিকে উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের পথে একটি বড় ধরণের বিজয় ধরে নিয়ে ষড়যন্ত্রের ও চক্রান্তের নতুন জাল বিস্তার শুরু করেছে। তারা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন জুমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য রীতিমত তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা চুক্তিমাফিক শান্তিবাহিনীর একটি অংশ দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রিজিওনাল কাউন্সিল গঠনের পাশাপাশি শান্তি বাহিনীর অপর অংশ ও বিপথগামী বেকার চাকমা যুবকদের দিয়ে গঠন করেছে শান্তিবাহিনীর চাইতেও ভয়ংকর এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত 'জুম ন্যাশনাল আর্মি' (J.M.A)। জনসংহতি সমিতির শূন্যস্থানে গঠন করেছে 'জুম্ম ন্যাশনাল ডেমোক্রোটিক ফ্রন্ট (J.N.D.F) 'র'-এর সাহায্য শান্তিবাহিনী একদিকে যেমন নতুন করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, লুট, ধর্ষণ শুরু করেছে, তেমনি একইভাবে নিত্য-নতুন একাধিক সশস্ত্র উপজাতীয় সংগঠনের জন্ম দিচ্ছে। ভারত থেকে দেদার অস্ত্র আসছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। জনমনে নতুন করে দেখা দিয়েছে ভীতি। এই ভীতি আরও বাড়িয়ে তুলেছে ভারত থেকে আসা শারনার্থীরা। ধারণা করা হচ্ছে চাকমা শরনার্থী হিসাবে ভারত যাদের বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে, তাদের বিরাট একটি অংশ ভারতীয় নাগরিক। এরা শরনার্থী হিসাবে বাংলাদেশে ঢুকে ভবিষ্যতে নানা নাশকতামূলক কার্যক্রমে যে অংশ গ্রহণ করবে, তার আলামত ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে। এখন (J.N.D.F) এবং (J.N.A.) এই দুটি সংগঠনের কাজ অতি গোপনে চলছে। শান্তিবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে সারেন্ডার করলেই পার্বত্য চট্রগ্রামকে জুমল্যান্ড তথা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এই সংগঠন দু'টিকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা, 'র' সহ বিভিন্ন খৃষ্টান ও বুড্ডিষ্ট রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা মদদ দিচ্ছে বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে।

সড়ক, নৌ ও বিমান পথ সর্বত্রই বিপত্তি

৩৭ টি জেলার সাথে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পশ্চিম তীরের ৩৭ টি জেলার প্রায় ৬ কোটি মানুষ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বাকী অংশের সাথে অনেকটা যোগাযোগ শূন্য হয়ে পড়েছে। বরিশাল-খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সাথে সড়ক পথে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের জেলাসমূহের সড়ক যোগাযোগ ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রেল যোগাযোগ অনেকটা বিপন্ন, আকাশ যোগাযোগ বন্ধ।

পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পশ্চিম তীরের সাথে পূর্বতীরের সড়ক যোগাযোগ রক্ষাকারী আরিচা-দৌলতদিয়া এবং আরিচা নটাখোলা ফেরী সার্ভিস গত কয়েকদিন ধরেই বিপর্যস্ত হয়ে আছে। মন্ত্রনালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণও আরিচাতে গিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি করতে সক্ষম হননি। ঘন কুয়াশার পাশাপাশি নৌপথের নানান বিপত্তি এবং ফেরীঘাট সমূহে ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে পরিস্থিতির অবনতি অব্যহত রয়েছে। খুলনা বিভাগ ছাড়াও ফরিদপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার সাথে রাজধানীর সরাসরি কোন রেল যোগাযোগ নেই। উত্তর বঙ্গের সাথে রাজধানীর রেল সংযোগ [illegible]লেও তা নির্বিঘ্ন বা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। বিত্তবান ও জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে আকাশ পথে রাজধানীর সাথে যশোর, রাজশা[illegible] [illegible]দপুরের যে বিমান ব্যবস্থা ছিল তা-ও গত ২৩ [illegible] বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য পরে দেরীতে হলেও [illegible] মাঝেমধ্যে দু/একটি বিমান চলছে। তবে তার সময় অসময় নাই। সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ এখন খুলনা,যশোর, কুষ্টিয়া ও এর সন্নিহিত এলাকার জনগণ। সেখান থেকে রাজধানীর কোন সরাসরি রেল

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সংযোগ নেই। আরিচা দৌলতদিয়ার ফেরী সমস্যার কারণে সড়ক যোগাযোগও বিপর্যস্থ হয়ে পড়ছে ঘন ঘন। প্রায়শই ঘন কুয়াশা এ পথে বিপথের মাত্রাকেও বৃদ্ধি করছে।

লংমার্চ শেষে রামগড়ের মহাসমাবেশ থেকে ইসলামী ঐক্যজোটের ঘোষণাঃ

অবিলম্বে পার্বত্য কালো চুক্তি বাতিল না করলে আবারো লংমার্চ ডাকা হবে

গত ২৯ ডিসেম্বর দেশের অখন্ডতা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী কালো চুক্তি বাতিলের দাবীতে ঐতিহাসিক লংমার্চ (২৮ ডিসেম্বর) শেষে রামগড়ে আয়োজিত মহাসমাবেশে ইসলামী ঐক্যজেটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি আমাদের জায়নামাযের মত পবিত্র। প্রতি ইঞ্চি মাটি বুকের রক্ত দিয়ে হেফাজত করা হবে। দেশ বিভক্তির কালো চুক্তির মাধ্যমে দেশের এক দশমাংশ অঞ্চল (পাবর্ত্য চট্টগ্রাম) ভারতের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে। বক্তাগণ দৃঢ়তার সাথে বলেন, লংমার্চের মাধ্যমে স্বাধীনতার রক্ষার আন্দোলন শুরু হয়েছে। অসম চুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যহত থাকবে।

সিলেটে ভয়াবহ বিমান দূর্ঘটনাতে অলৌকিকভাবে সকল যাত্রী ও ক্রুদের প্রাণ রক্ষা

গত ২২ ডিসেম্বর রাত ১০টা ৪০ মিনিটে সিলেট শহর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে মেটকার হাওড়ে ৮৮জন যাত্রীর একটি যাত্রীবাহী বিমান এক ভয়াবহ দূর্ঘটনায় পতিত হয়। ঢাকা থেকে সিলেটের পথে ছেড়ে যাওয়া বাংলাদেশ বিমানের ৬০৯ ফ্লাইটটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণের প্রস্তুতির মুহূর্তে বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে প্রায় ৫কিঃমিঃ দূরে এই দূর্ঘটনার কবলে পড়ে।

উত্তরাঞ্চল প্রদেশ বাস্তবায়নের দাবী

দেশের উত্তরাঞ্চলকে প্রদেশে রূপান্তরিত করার দাবী আবারও জোরদার হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি, রাজশাহী আইনজীবী বার সমিতির ১'শ ১জন সিনিয়র আইনজীবী উত্তরাঞ্চল প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদের উত্থাপিত ছয় দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। উত্তরাঞ্চল প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদ একটি মাত্র প্রশাসনিক ইউনিটের অবসান করে ফেডারেশন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম, রাজশাহীসহ দেশের পুরাতন ৪টি বিভাগে প্রাদেশিক মর্যাদাদান,প্রদেশভিত্তিক একটি করে হাইকোর্ট ও বার কাউন্সিল নির্মাণ করতে হবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় পরিচালনা, ভারী শিল্প স্থাপন, মুদ্রা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাজ সম্পাদন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করাসহ ৬ দফা দাবীতে আন্দোলন করে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা রক্ষায় জাতকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে বিজয় দিবস উদযাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা ও ব্যাপক কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে এইদিন সকালে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভারে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে এবং দেশের উন্নয়ন এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দিবসের কর্মসূচীর সূচনা করেন। এর পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন সাভার থেকে তাদের দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজেই মানবাধিকার বেশী লংঘিত হয়

গত ১০ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ 'স্বাধিকার পরিষদ' 'মানবাধিকার বাংলাদেশ প্রেক্ষিত'-এর উপর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে আলোচকগণ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, বাংলাদেশ শিক্ষিত সমাজের হাতে সবচেয়ে বেশী মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। বক্তাগণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, যে দেশে আইনের শাসন নেই, সেখানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বুলি অর্থহীন। বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর ডঃ এম এরশাদুল বারী। অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি ছিলেন বিচারপতি আব্দুর রউফ। সেমিনারে বক্তাগণ রাষ্ট্র কর্তৃক ও শিক্ষিত সমাজই অধিকার ক্ষুণ্ন বেশী করে বলে উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশে মানবাধিকার লংঘিত হওয়ার কথা তুলে ধরেন।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছেঃ সাগরে বাড়বে পানির উচ্চতা এগিয়ে আসছে পরিবেশগত বিপর্যয়ঃ

বাংলাদেশের ১৭ ভাগ ভূমি বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে যাবে

বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। আগামী শতাব্দীর প্রথম ৩০ বছরের ভিতরে বাংলাদেশে মারাত্মক ধরণের বিপর্যয় ঘটবে। বঙ্গোপসাগরের পানি বর্তমান উচ্চতার চেয়ে আরও ৩ ফুট বেড়ে যাবে। আর এতে করে উপকূলীয় এলাকার লাখ লাখ লোক পরিবেশগত উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে। সাগরে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবার কারণে দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ ভূমি পানির নীচে তলিয়ে যাবে। তলিয়ে যাওয়া ভূমির পুরটাই গোটা উপকূলীয় এলাকার হবে। বৃষ্টিপাতের

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিমাণ বৃদ্ধিসহ তা বর্তমান সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত হবে। এর ফলে ফসল এবং ফলমূলের উৎপাদন কমে যাবে। এই বিপর্যয় ঠেকানোর কোন কৌশল এখনো কারো জানা নেই।

বরফের মত কুয়াশা ও বৃষ্টির মতো শিশির ঝরছে উত্তর জনপদে প্রচণ্ড শীত, মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি, জনজীবন অচল

সপ্তাহকাল ব্যাপী আকাশ মেঘলা ও বৃষ্টিপাতের পর গত ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর জনপদ প্রচণ্ড শীত পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীতে জন জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মৃতের সংখ্যা উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকাতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঈশ্বরদী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। উত্তরের ঝড়ো শৈত প্রবাহে মানুষের দুর্ভোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ হাড় কাঁপানো শীত উত্তর জনপদের লাখ লাখ মানুষকে কাবু করে ফেলেছে। গবাদি পশুগুলো কাঁপছে। রবি মৌসুমের অনেক ফসলে দেখা দিয়েছে ছত্রাক। ডাইরিয়া ও চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। খবরে জানা যায়, সারা দেশের তাপমাত্রা নিচের দিকে রয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর দিনের শেষে ঈশ্বরদী ও দিনাজপুরে ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। তাপমাত্রা আরও দ্রুত কমে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী তাপমাত্রা নেমেছিল ২.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। সর্বশেষ খবরানুযায়ী দেশের উত্তাঞ্চলের তাপমাত্রা ৮-৫.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমেছে এবং জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলছে।

ইরানে আন্তর্জাতিক তাফসীর প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথম

ইরানে অনুষ্ঠিত আন্তজাতিক তাফসীর প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে। এতে এবার স্বর্ণপদকটি লাভ করেছেন কিশোর গঞ্জের তারাইল থানার আরীফ উদ্দীন মারুফ। প্রতিযোগিতায় হিফযুল কুরআন বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মোঃ আযহারুল ইসলাম। তাফসীর প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে আরীফ উদ্দীন মারুফ ৫০ ভরি সোনার একটি ক্যাসকেট, নগদ ৩ লাখ ইরানী রিয়েলসহ বহু মূল্যবান সামগ্রী লাভ করেন। অপরদিকে হেফযুল কুরআনে তৃতীয় হয়ে হাফেয নুরুল ইসলাম ২০ ভরি সোনার একটি ক্যাসকেট ও তিন লাখ ইরানী রিয়েল লাভ করেন। গত ২৮ নভেম্বর ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় উদ্বোধন করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ খাতামি এবং পুরস্কার বিতরণ করেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী। প্রতিযোগিতায় তাফসীর বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমীরাত ও ইয়েমেন।

বিদেশ

হংকংয়ে 'মুরগীফ্লু' রোধে ১০ লাখ মুরগী নিধনের পদক্ষেপ

হংকংয়ে মুরগী থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এক নতুন ধরণের সংক্রামণ দেখা দিয়েছে, যাকে 'মুরগী ফ্লু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই ফ্লু রোধের প্রচেষ্ঠায় ১০ লাখেরও বেশী মুরগী নিধনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই ফ্লুরোগজীবাণু মুরগীর সংগে সরাসরি সংস্পর্শে আসার ফলে বিস্তৃতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত এ সংক্রমণে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে এবং আরও ২০ জনের সংক্রমণ ঘটেছে। এছাড়া শতশত লোক হাসপাতালে ভীড় করছে এই আশংকায় যে, তারা হয়তো ঐ রোগ জীবাণুর সংস্পর্শে এসে থাকতে পারেন।

বাইসাইকেল যোগে ১২ বছর বিশ্বভ্রমণ শেষে ভারত প্রত্যাবর্তন

ভারতের তাহের মাদরাসাওয়ালা বাইসাইকেল যোগে ১২ বছর বিশ্ব ভ্রমণ শেষে দেশে পৌঁছালে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাকে অভিনন্দন জানায়। মাদ্রাসা ওয়ালা সর্বজনীন শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের উন্নয়নে ১৯৮৫ সালে বিশ্বভ্রমণে বের হন এবং ৩৪ টি দেশের প্রায় ১ লাখ ২৮ হাজার কিলেমিটার পথ অতিক্রম করে গত ২৩ ডিসেম্বর গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় আহমেদাবাদে তার নিজ শহরে ফিরে আসেন।

উপ-আঞ্চলিক জোটঃ শ্রীলংকার বিরোধিতা

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর মধ্যে কোন ধরণের উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। পাকিস্তানে সফররত প্রেসিডেন্ট কুমারতুঙ্গা গত ২১ ডিসেম্বর এক সেমিনারে ভাষণদানকালে বলেছেন, সার্কভুক্ত দেশগুলো নিজেদের বিবাদ নিরসনের জন্য একে অন্যের জন্য সংলাপ চালাতে পারে এবং সার্কের কাঠমোর মধ্যেই দ্বি-পাক্ষিক ইস্যুসমূহ আলোচনা ও মীমাংসার জন্য গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন, ভৌগলিক, নৈকট্য, সহজ যোগাযোগ ইত্যাদির আড়ালে যে উপ-আঞ্চলিক জোট তত্ত্ব চালু করা হয়েছে তা সার্ক কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক। উল্লেখ্য, আঞ্চলিক উন্নয়নের ওজুহাতে নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত সার্কের মূল চেতনা বিরোধী উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

বিশ্বে এই প্রথম সুইডেনে যৌন অপরাধ রোধের উদ্যোগ

সুইডেনে যৌন অপরাধ রোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্বে এই প্রথম কোন দেশে এ ধরণের উদ্যোগ নেয়া হলো। গত ১৮ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে যৌন অপরাধ সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিল অনুমোদিত হলে জানুয়ারীর পর কোন ব্যক্তি পতিতালয়ে গেলে তাকে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড ভোগ করতে হতে পারে।

ভারতের পতিতালয়ে ৩০ হাজার বাংলাদেশী কিশোরী ও তরুণী ধুঁকে ধুঁকে শেষ হচ্ছে

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশের প্রায় ৩০ হাজার কিশোরী ও তরুণীকে জোর পূবর্ক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়েছে। এসব তরুণীর উপর চলছে নির্মম নির্যাতন। বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারী চক্র বেআইনীভাবে বিভিন্ন সময়ে এদের ভারতে নিয়ে যায়। ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, কেরালা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মনিপুর, প্রভৃতি রাজ্যের এবং দিল্লীর বহু পতিতালয়ে এরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এদের দেশে ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ নেই। হিন্দুস্থানী পতিতাদের সংগঠন ৮/২, ভবানীদত্ত লেন, কলিকাতা ৭০০-০৭৩- এই ঠিকানায় অবস্থিত" দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির" এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পায়।

জাতিসংঘে মহিলা উপ-মহাসচিব নিয়োগ করা হচ্ছে

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একজন মহিলা উপ-মহাসচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ঘটনা জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথম। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান একজন মহিলাকে উপ- মহাসচিবের পদে নিয়োগের চিন্তা ভাবনা করছেন। এই পদে কানাডার প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী লুয়িচ ফ্রিচেটকে নিয়োগ দান করার ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা চলছে।

ভারতে সতীদাহ বেড়ে চলেছে

ভারতে এখনও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। গত বছর ও ১০টি সতীদাহের ঘটনার কথা জানা গেছে। গত বছর ভারতের জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ১৯৯২ সালের পর থেকে সতীদাহের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, সে বছর সতীদাহের ঘটনা ঘটেছিল মাত্র একটি । অথচ ১৯৯০ সালে ৫০টির বেশী সতীদাহ রেকর্ড করা হয়। বৃটিশ সরকার সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে। ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের ছোট্ট শহর দিওরালায় স্বামীর চিতায় তরুণী রূপকানোয়ারের স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের ঘটনা প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে পরে দাবী করা হয় যে, রুপকানোয়ারের নামে ঐ তরুণীকে জোরপূর্বক তার স্বামীর সঙ্গে দাহ করা হয়েছে। ঐ ঘটনার ব্যাপারে এক মামলায় প্রায় এক দশক পর আদালত এই হত্যাকান্ডের অভিযোগ থেকে ৩০ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেয়।

বিহারে এক রাতে নিম্নবর্ণের ৭৫ জন হিন্দুকে গুলি করে হত্যা

ভারতে হিন্দু ভূস্বামীদের একটি পেটোয়া বাহিনী সোমবার রাতে বিহারের রাজধানী পাটনার কাছাকাছি একটি গ্রামে ঝটিকা হামলা চালিয়ে ৫০ জন নিম্নবর্ণের হিন্দুকে গুলি করে হত্যা করে। পাটনার জেলা কমিশনার লাল সোতা পি টি আইকে এ খবর দিয়েছেন।

উত্তর কোরিয়ায় মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের মাংস খেতে বাধ্য হচ্ছে

গত দু'বছরের মারাত্মক বন্যা ও খরার পর উত্তর কোরিয়ার খাদ্য সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ক্ষুধার তাড়নায় উত্তর কোরিয়বাসীরা গাছের পাতা, বাকল এবং কখনো কখনো মানুষের মাংসও খেতে বাধ্য হচ্ছে। দঃ কোরিয়ার একটি মানবিক সংগঠন জানিয়েছে, চীনে অবস্থানরত উঃ কোরিয় উদ্বাস্তুরা তাদের দেশে খাদ্য ঘাটতি সম্পর্কে এই ভয়ংকর ঘটনা বর্ণনা করেছে। একটি জরীপে দেখা গিয়েছে, গত দু'বছরের ক্ষুধার তাড়নায় তাদের শতকারা ২৪ ভাগ শিশু প্রাণ হারিয়েছে, এতে ১০৯ বছরের শিশুরাই বেশী মারা গেছে।

(সংকলিত)

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম জাহান

১৯৯৭ সালে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের আশা অলীক প্রমাণিত হয়েছে

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীতে দু'দেশের মধ্যে কাশ্মীর প্রশ্নে সৃষ্ট বিরোধ অবসানের আশা ১৯৯৭ সালে অলীক প্রমাণিত হয়েছে।

এ অঞ্চলে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফরের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১২টি মাসেই কাশ্মীর সংক্রান্ত খবর প্রাধান্য পাবে তা মোটামুটি নিশ্চিত করে বলা চলে। বিশ্বের যতগুলো ভূ-খন্ডগত বিরোধ রয়েছে তার মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা সবচেয়ে জটিল। ১৯৯৮ সালেও এ সমস্যার একটা সুরাহা হবে বলে খুব কম লোকেই আশা করে।

ভারতের মানবাধিকার কর্মী কুলদপি নায়ারের মতে, ১৯৯৭ সালে কাশ্মীর সমস্যার একটা সত্যিকার সমাধানের একটা সুযোগ এসেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর এই কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দু'দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

পাকিস্তানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে এই দুইজনের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। কুলদীপ নায়ার বলেন, এই দুইজন শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম প্রতিনিধি ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারত-পকিস্তান ভাগ হয়ে যাবার ফলে যে বিয়োগান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এই দু'জনের উভয়েরই পরিবার সেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতির শিকার।

তাদের দু'জনেরই এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে একই রকম ঐকান্তিকতা ও ইতিবাচক মানোভাব ছিল। তাদের উভয়কেই কাশ্মীর প্রশ্নে একটি রাজনৈতিক ঝুঁকি নেয়ার জন্য প্রস্তুতি দেখা গিয়েছিল। মিঃ নায়ার এখনও আশাবাদী রয়ে গেছেন, তবে তিনি এ ব্যাপারে একটা দীর্ঘসূত্রতার কথা স্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন, গত মার্চ মাসে আলোচনা যখন শুরু হয়েছিল, তখনই একটা দীর্ঘসুত্রতার দিকে যাচ্ছিল, যা সকলেই জানেন। গত আক্টোবর মাসে আমি যখন নওয়াজ শরীরের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগতে পারে অর্থাৎ এর কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না।

তালিবান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের উলেমাদের সাথে সংলাপে রাজি

তালিবানদের সর্বোচ্চ নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর গত ২৮ ডিসেম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের উলেমাদের সাথে সংলাপ শুরু করার জন্য রাজি হয়েছেন।

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আফগানিস্তানে একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব শামসাদ আহমদকে বলেন, যদি বিরোধী দল আফগানিস্তানে শান্তি চায় এবং একটি ইসলামী সরকারের আকাঙ্খা করে তাহলে তারা আলোচনার জন্য উলেমাদের একটি প্রতিনিধি দল মনোনীত করবে। তালিবানদের তথ্যমন্ত্রী মোল্লা আমীর খান বলেছেন, তালিবানরা রাজনৈতিক সংলাপের জন্য একই ধরণের একটি দল মনোনীত করবে। উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশ প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের দখলে রয়েছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের বিশেষ দূত শামসাদ আহমদ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় কান্দার শহরে তালিবানদের সদর দফতরে সফর করেন। তালিবান প্রধান বলেন, ১৯৭৮ সালে আফগান উলেমারা এক ফতোয়ার মাধ্যমে আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার পর আফগান জনগণ অস্ত্র ধারণ করে।

লিবিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে

-ফারাহ খান

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন অব ইসলামের নেতা লুই ফারাহ খান গত ২১ ডিসেম্বর রাতে লিবীয় নেতা মোয়াম্মার গাদ্দাফীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা ইসলামী উম্মাহ ও যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই কৃষ্ণাঙ্গ নেতা লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলীতে জনাব গাদ্দাফীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এর আগের রাতে লিবিয়া পৌছানোর পর জনাব ফারাহ খান বলেন, লিবিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিত। কেননা এর ফলে মহিলা ও শিশু কিশোররা মৃত্যুবরণ করছে। জনাব খান বলেন, অবরোধ গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মত। ন্যাশন অব ইসলামের নেতা বর্তমানে বিশ্ব সফর করছেন। ইতিমধ্যে তিনি ইরাক সফর করেছেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রদপ্তরের কর্মকর্তারা জনাব ফারাহ খানকে লিবিয়া ও ইরাক সফর না করার জন্য বলেন।

সিন্ধু হাইকোর্টের রায়ঃ আসিফ জারদারি সিনেট সভায় যোগ দিতে পারবেন

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের হাইকোর্ট জেলখানায় বন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভূট্টোর স্বামী আসিফ জারদারিকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সিনেট অধিবেশনে যোগদানের পক্ষে রায় দিয়েছে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে বে-নজীর ভূট্টোর সরকারকে বরখাস্ত করার পর থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় করাচীতে একটি জেলখানায় আসিফ জারদারিকে আটক রাখা হয়েছে। আসিফজারদারি পাকিস্তানের সিনেট সভার একজন সদস্য।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসরাইলকে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' হিসাবে নিন্দা জানিয়ে ওআই সি শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ১৪২ টি প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে তেহরানে তিনদিন ব্যাপী ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে। সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পদহীন সদস্য দেশগুলোর জন্য অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করতে ওআইসি সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ইরানের রাজধানী তেহরানে গত ১১ ডিসেম্বর ৫০টিরও বেশী মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়ার উপর ৬টি প্রস্তাব পাস হয়েছে। এগুলোতে ইসরাইলের ডানপন্থী সরকারের নিন্দা এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে, একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রগঠনের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক প্রস্তাবে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বন্ধ, কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা, ইসলামী মানবাধিকার সনদ, মুসলিম বিশ্বে নারী অধিকারের প্রতি সমর্থন এবং একটি ইসলামী অভিন্ন বাজারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় স্থান পেয়েছে। তেহরান ঘোষণা নামে অভিহিত একটি সরকারী ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলামী সংস্থা ওআইসি'র ৮ম শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্তি ঘোষিত হয়। তিন বছরের মধ্যে পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন কাতারে হতে পারে।

মুহাম্মাদ রফিক তারার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের মনোনীত প্রার্থী মুহাম্মাদ রফিক তারার গত ৩১ ডিসেম্বর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দেশের প্রেসিডেন্ট নিবাচিত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। জনাব তারার ইসলামাবাদে ফেডারেল পার্লামেন্টের ২৯৮টি ভোটের মধ্যে ২৪৫টি ভোট পেয়েছেন। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রার্থী আফতার শাবান মিরানি পেয়েছেন ৩৯ ভোট। জনাব রফিক তারার ১ জানুয়ারী শপথ গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদটি মূলতঃ আনুষ্ঠানিক। প্রধান বিচারপতি সাজ্জাদ আলী শাহ'র সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের বিরোধের প্রতিবাদে গত ২ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদ লেঘারী পদত্যাগ করলে এই পদটি শূন্য হয়।

ইরাকের কাছে জীবাণু বা রাষায়নিক অস্ত্র নেই

-রুশ নেতা

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূল সংক্রান্ত জাতিসংঘের দাবী মেনে চলেছেন। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতা গেন্নাদি যুগানভ ইরাকী নেতার সঙ্গে তার বৈঠক এবং আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানাতে গিয়ে একথা বলেন। গত নভেম্বরের শেষদিকে এই বৈঠক হয়। তিনি বলেন, এটা পরম সত্য যে, ইরাকের কাছে জীবাণু বা রাষায়নিক অস্ত্র নেই।

(সংকলিত)

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

১৯৯৭' কে বলা হচ্ছে New Super Scientific Age (NSSA)-পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। এই NSSA'র পর পৃথিবীতে শুরু হবে invisble বা অদৃশ্য মহাজাগতিক জগত।

১৯৯৭'কে বলা হচ্ছে New Super Scientific Age (NSSA)- পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। এই NSSA'র পর পৃথিবীতে শুরু হবে invisible বা অদৃশ্য মহাজাগতিক জগত। একে ভুতুরে বা স্বর্গীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন কালকে ভাগ করা হয় এভাবে- বরফ যুগ, প্রস্তর যুগ, মধ্যযুগ, নবযুগ, আধুনিক যুগ, যান্ত্রিক যুগ। এই ছয়টি যুগ কাটিয়ে আজ মানুষ এসেছে NSSA যুগে। রক্ত-মাংসের দেহজ প্রবৃদ্ধি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় NSSA যুগের পর আর কোনো যুগ শুরু হবে না আগের মতো। এরপর আসবে গোটা ছন্দপতন এবং আরেকটি Invisible Age-এর সূচনা পর্বে। তবে NSSA যুগ খুবই মারাত্মক যুগ। এ যুগে মানুষ পৌঁছে যাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম শীর্ষে। মানুষের বোধকরি দরকার হবে না দেহজ বা মাংসিক উপস্থিতির। ১৯৯৬-৯৭ সালেও যুগে মানুষ যেভাবে কম্পিউটারকে ব্যবহার করেছে তা রীতিমতো অভাবনীয় ও ভয়াবহ। এ বছরই সুদূর আমেরিকা থেকে এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত যে কোনো রোগীর চিকিৎসা হবে কম্পিউটারের মাধ্যমে। রোগী শুয়ে থাকবে এশিয়ায় আর আমেরিকা বিশেষজ্ঞরা তার অস্ত্রোপচার করবে নির্বিঘ্নে। মানব জাতির যে কোনো স্থানের সম্ভাব্য যে কোনো বিদ্রোহ স্বল্প সময়ে স্তিমিত করা সম্ভব হবে। সাগরের নিচে বা ভূমির ওপরে এমন কোনো ইঞ্চি পরিমাণ স্থান বাদ থাকবে না যা পৃথিবীর সম্প্রচার কেন্দ্রের বাইরে থাকবে। এমনকি মানুষের গৃহের অভ্যন্তরের গোটা বিষয় জানা যাবে বিশেষ উপগ্রহের মাধ্যমে। এই বিশেষ উপগ্রহ পৃথিবীর ঊর্ধ্বে, অন্তে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র প্রতিটি ধূলিকণার নিরাপত্তা বিধান করবে। এ তো গেল কমিউনিকেশন ও কম্পিউটারের কথা।

NSSA যুগে মানব দেহের যে কোনো অংশ বৃদ্ধি করা, সংকীর্ণ করা, সীমিত করা, পুনঃস্থাপন করা, সংযোজন ও বিয়োজন করা সম্ভবপর হবে। হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, কিডনি, ফুসফুস, লিভার মোটকথা এমন কোনো দেহাংশ থাকবে না যা মানুষ উৎপাদন করতে পারবে না। অর্থাৎ আগামীতে মানুষ তার নিজ অবয়ব বা দেহজাত রূপ ডিএনএ বা যে

http://islaminonesite.wordpress.com

কোনো কোষবিন্যাস করে বেঁচে থাকবে। এ কোষের ক্রমাগত উন্নয়ন যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয় তা হলে যে জিনের পরাগে মানুষ সৃষ্ট হবে আগামীতে তাঁর যৌবনকাল দাঁড়াবে সুদীর্ঘ, হতে পারে ধীরে ধীরে নিজ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। NSSA যুগে প্রথমে ১০০, তারপর ধীরে ধীরে ১৫০, ২০০, ৩০০, ৪০০ বছর পর্যন্ত মানুষের প্রজাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে, তবে বর্তমান এ যুগের পতনের পূর্বে নয়, এ যুগে মৃত্যুর মাঝে শেষ হলে পর ধীরে ধীরে সেই ডিএনএ বা জিন এর মহাজাগতিক দেহাবয়বের যুগ শুরু হবে। মানুষের দেহ শুধু নয়, জীবনধারণেও এর আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। সেই একই পদ্ধতিতে সকল প্রাণবৎ, জীবকূল ও উদ্ভিদকূলে আসবে মহা NSSA যুগের পরিবর্তন। এমনি এক আগামী দৃষ্টি হাতছানি দিচ্ছে গোটা মানব সমাজকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগেঃ মানুষ জীব ও উদ্ভিদ সমন্বয়ে নতুন আরেক জিন বিশিষ্ট প্রজাতিতে রূপান্তরিত না হয়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এমন প্রসার ঘটবে এই NSSA যুগে যাতে মানুষের আগামীতে ওয়্যারলেস সেট বা কম্পিউটারের কতগুলো সাংকেতিক শব্দ বা চিহ্নের প্রয়োজন হবে শুধু। বাকি যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষ নিজেই স্বরূপে বা অদৃশ্য রূপে সম্পন্ন করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, NSSA যুগ হলো রক্তমাংসের সেই বরফ যুগ বা প্রস্তরের আদি যুগ বলি সেই মানুষটির সর্বশেষ রক্তকণিকার দৌড়। এর বাইরে রক্তসাংসের মানুষের যাবার ক্ষমতা নেই। সে সহায়ক শক্তি, যেমন-কম্পিউটার তৎসহ যান্ত্রিক ব্যবহার করে আরও উন্নতি করবে ঠিকই, কিন্তু নিজে থেকে যাবে সসীম, ফলে তাঁর সৃষ্টিতেও থাকবে সীমাহীন সন্দেহ ও সতর্কতা। এই NSSA যুগে মানুষের বেশির ভাগ মৃত্যু হবে মানুষের দ্বারা। মহামারি, দুর্ভিক্ষ, নৈসর্গিক দুর্বিপাক যত প্রাণ নাশ করবে তার চেয়ে বেশী করবে মানুষ মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। ফলে মানুষ স্বভাবত,আর সেই মানুষটি, ভালবাসা স্নেহ, পবিত্র, মধুর মৃদু স্বভাবটি "Humani" থাকবে না-হয়ে যাবে অন্য কিছু- না মানুষ, না দেবতা। না উদ্ভিদ না জীব। না পশু না স্বর্গীয়। না দৃশ্য না অদৃশ্য এমনিতর হয়ে যাবে NSSA-'র আগামী প্রজন্ম। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ আর মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না, ব্যক্তি মতাদর্শই স্ব স্ব ক্ষেত্রে হয়ে যাবে সার্বভৌম। আমরা এই SSA যুগের মানুষঃ যা চলবে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ। আমরা সবাই অত্যন্ত ভাগ্যবান, যারা ১৯০০ সাল থেকে ২০০০ সালে হয়ে ২০০১ সাল পড়বো-কিন্তু একই সময় আমরা ভয়ানকভাবে অভিশপ্তও বটে।

সৌজন্যেঃ সাপ্তাহীক অহরহ

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১(৩৪)ঃ বড় ভাই পাঁচ হাযার টাকায় একটি ছাগল কুরবানী করল, আর ছোট ভাই চার হাযার টাকায় দু'টি ছাগল কুরবানী করল, এদের মধ্যে কার ছওয়াব বেশী হবে।

মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
গ্রামঃ গড়ের ডাঙ্গা
পোঃ সেনের গাতী
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহান রব্বুল আলামীনের নিকট নিয়ত ও ইখলাছ অনুসারে বান্দার আমল গৃহীত হয়ে থাকে এবং সে অনুপাতে বান্দা নেকী পেয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে একমাত্র খাঁটি নিয়ত ও ইখলাছ সহকারে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলা হয়েছে' (সূরা বাইয়্যেনাহ, ৫)। অনুরূপভাবে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের যাবতীয় আমলের ফলাফল তার নিয়তের উপরেই নির্ভরশীল' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ১)। এছাড়া বিশেষভাবে কুরবানীর বিষয়ে তো পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'এগুলোর (কুরবানীর) গোস্ত আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না। আল্লাহ্র নিকট একমাত্র পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া' (সূরা হজ্জ ৩৭)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কে কত বড় ও কত সংখ্যক কুরবানী করল সেটি আল্লাহ্র নিকট তেমন বিষয় নয়। আল্লাহ্র নিকট মূল বিষয় হচ্ছে এই যে, কুরবানী দেওয়ার মূলে বান্দার ইখলাছ ও তাক্বওয়া কিরূপ? সে অনুপাতেই তিনি বান্দাকে নেকী প্রদান করবেন। সুতরাং বান্দা তার ইখলাছ ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই বিবেচনা করবে যে, সাধ্য অনুযায়ী তার কুরবানী কিরূপ ও কত সংখ্যক হওয়া চাই।

অতএব পাঁচ হাযার টাকায় একটি কুরবানী ও চার হাযার টাকায় দু'টি কুরবানীর মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক নেকী প্রাপ্ত হবে যার ইখলাছ ও তাক্বওয়া অধিক হবে। যদি দু'জনেরই ইখলাছ ও তাক্বওয়া সমান হয় তবে দু'জনের-ই সমান নেকী হবে। আর তাক্বওয়ার মান নির্ণয়ের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর পশুর প্রতি লোমে একটি নেকী হাছিল হওয়া, কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর, লোম ইত্যাদি ওজন হওয়া সম্পর্কিত ফযীলতের আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজা'র হাদীছগুলির সনদ যঈফ (আলবানী, মিশকাত, 'উযহিয়া' অধ্যায় হা/ ১৪৭০ ও

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

১৪৭৬ -এর টীকা দ্রষ্টব্য)। ফলে এর ভিত্তিতে কুরবানীর নেকী নিরুপন করা উচিত নয়।

প্রশ্ন-২(৩৫)ঃ কোন ব্যক্তি যদি কাউকে এই চুক্তিতে ঋণ প্রদান করে যে, ঋণ গ্রহীতা যতদিন তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন যাবৎ সে ঋণ গ্রহীতার প্রদত্ত বন্ধক জমি ভোগ করতে থাকবে। ইহা শরীয়তে বৈধ কি-না? যদি না হয় তবে কিভাবে বন্ধক রাখা বৈধ হবে? দলীলসহ উত্তর দিলে উপকৃত হব।

মুহাম্মদ ফযলুর রহমান
গ্রামঃ গড়ের ডাঙ্গা
পোঃ সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ ঋণ গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বন্ধক জমি ভোগ করা অবৈধ। যদিও বন্ধক প্রদানকারী স্বেচ্ছায় অনুমতি প্রদান করে। কেননা এরূপ বন্ধক বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া নিঃসন্দেহে সুদের অর্ন্তভুক্ত। আর যদি বন্ধক বস্তু এমন ধরণের হয় যাকে অটুট রাখতে হ'লে তার পিছনে শ্রম ও অর্থ ব্যয় আবশ্যক, তাহলে শুধু শ্রমের মজুরী ও অর্থ ব্যয় পরিমাণে বন্ধক বস্তু হ'তে উপকৃত হ'তে পারে। তার বেশী নয়। কেননা বেশীটুকু সুদ হিসাবে গণ্য হবে। দলীলস্বরূপ কতিপয় হাদীছ ও বিদ্বানদের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল-

'হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, ব্যয় অনুপাতে বন্ধক জন্তুর উপর আরোহণ করতে পারবে এবং ব্যয় অনুপাতে বন্ধক দুধ দানকারী পশুর দুধ পান করতে পারবে'।

হযরত মুগীরা (রাঃ) ইব্রাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, 'কুড়িয়ে পাওয়া পশুর চরানোর খরচ অনুপাতে আরোহণ করতে ও দুধ দহন করতে পারবে এবং বন্ধক কৃত পশুর ক্ষেত্রেও অনুরূপ'।

সাঈদ বিন মানছুর মুত্তাছিল সনদে বর্ণনা করেন যে, চরানোর খরচ পরিমাণ বন্ধক কৃত পশুর উপর আরোহণ করতে ও সে অনুপাতে দুধ পান করতে পারবে'।

হাম্মাদ বিন সালামা তার 'জামে' গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, যখন কোন ছাগল বন্ধক রাখা হবে বন্ধক গ্রহণকারী ছাগলের চরানোর খরচ পরিমাণ দুধ গ্রহণ করতে পারবে যদি সে চরানোর দামের অধিক পরিমানে ছাগলের দুধ গ্রহণ করতে চায় তবে তা সুদ হবে (বুখারী, প্রথম খন্ড পৃঃ ৩৪১; ফাতহুল বারী ৫ম খন্ড পৃঃ ১৪৩-৪৪)। সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, 'অনুমতি পেলে বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধক হ'তে লাভবান হ'তে পারবেন (ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খন্ড পৃঃ ১৯৯৬)। মুহাদ্দিছগণ ও চার ইমামের অভিমতও তাই রয়েছে।

সুতরাং, শরীয়ত সম্মত বন্ধক এই যে, ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা স্বরূপ বন্ধক রাখতে হবে এবং ঋণ ফেরত পেলেই বন্ধক হুবহু ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বন্ধকী জমি বা বস্তু হ'তে লাভ বা উপকার গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন-৩(৩৬)ঃ বর্তমান সরকার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানসহ ইউ পি কাঠামো তৈরী করেছেন। এই ইউ পি কাঠামো ইসলামে স্বীকৃত কি-না? এবং এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ হবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে খুশী হব।

মুহাম্মাদ সুলতান মাহমুদ
সম্পাদক, পাকুড়িয়া এতীম খানা
ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আমাদের দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো ও নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শুধু তাই নয় বরং ইসলাম ধ্বংসের অত্যন্ত কার্যকরী পথও বটে। বর্তমান সরকারের নির্বাচন পদ্ধতি যেহেতু প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় এবং ইউ পি নির্বাচন ও ইউ, পি কাঠামোতে মহিলা মেম্বার ও ভাইস চেয়ামম্যান নিয়োগ তারই একটি অংশ, কাজেই শুধু পৃথকভাবে মহিলা নিয়োগের বিষয়টিকে দেখার অবকাশ নেই। বাকী রইল মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার ব্যাপার। শারঈ দৃষ্টিকোণে তা বৈধ নয়। কেননা ইসলাম মহিলা নেতৃত্বকে ভৎসনা করেছে। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' (সূরা নিসা ৩৪)। আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, 'কেস্‌রার কণ্যাকে পারস্যবাসীগণ তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেছে এরূপ সংবাদ যখন নবী (ছাঃ) -এর নিকট পৌঁছল নবী (ছাঃ) বলে উঠলেন, সেই সম্প্রদায় কখনো সফলতা লাভ করবে না যারা তাদের নেতৃত্ব কোন মহিলার হাতে সমর্পণ করে' (বুখারী ২য় খন্ড ৬৩৭ পৃঃ)।

অতএব, মহিলাদেরকে নিজ নিজ গন্ডীর মধ্যে থেকে নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশ ঘটানো উচিত এবং ইসলামের দেওয়া কল্যাণমন্ডিত রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামো প্রবর্তন ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নিবার্চন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মুসলিম রাজনীতিকদের অবশ্যই সোচ্ছার হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-৪(৩৭)ঃ সাহরীর আযান সম্পর্কে শরীয়তের অনুমোদন আছে কি? বর্তমানে সমাজে প্রচলিত সাহরীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করা ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত কি?

মুহাম্মাদ আলমগীর
প্রভাষক, জামতৈল ডিগ্রী কলেজ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সাহরীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বেলালের আযান তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে কখনোই যেন বাধা না দেয়' (মুসলিম, ১ম খন্ড ৩৫০ পৃঃ; মিশকাত ৬৬ পৃঃ)।

ইবনে ওমর হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বেলাল রাতে (সাহরীর) আযান দেয়। তোমরা ততক্ষণ

http://islaminonesite.wordpress.com

পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুমের (ফজরের) আযান শুনতে পাও' (বুখারী ১ম খন্ড ৮৬ পৃঃ; মুসলিম ১ম খন্ড ৩৪৯ পৃঃ; নাসাঈ ১ম খন্ড (৭৫) পৃঃ; মিশকাত ৬৬ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর আযান দেওয়া উচিৎ। এছাড়া সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারন জনগণকে জাগাবার জন্য প্রচলিত নিয়মে সাহরীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করা ইত্যাদি শরীয়ত পরিপন্থী ও মনগড়া কাজ। বিশেষ করে সাইরন ও পটকা ফুটানো ইয়াহুদীদের আচরণ (বুখারী ৮৫ পৃঃ; হাফেয আইনুল বারী, ছিয়াম ও রামাযান ৪৪ পৃঃ)।

প্রশ্ন-৫(৩৮)ঃ বর্তমান সমাজের মাযহাবী ফের্কার উৎপত্তি কখন থেকে এবং এর পরিণতি কি?

মুহাম্মাদ ছাদরুল আনাম
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম

উত্তরঃ ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমানের (রাঃ) খিলাফাতের শেষ দিকে বাহ্যিক মুসলমান ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা-এর কুটচক্রে মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম সাবাঈ ও ওছমানী দু'দলের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতে তৃতীয় খলীফা শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীকালে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া(রাঃ)-এর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী'আ ফের্কার উৎপত্তি হয় ও পরে এটি মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয়। এরপরে তাকদীরকে অস্বীকারকারী কাদারিয়া মতবাদ ও তার বিপরীত অদৃষ্টবাদী জাব্‌রিয়া মতবাদের জন্ম হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে সৃষ্টি যে প্রচলিত তাকলীদের উদ্ভব ঘটে, যা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয় (দ্রঃ শাহ অলিউল্লাহ হুজাতুল্লাহিল বালিগাহ 'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা শীর্ষক' অধ্যায়) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) (৮০-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক (৯৫-১৭৯), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) (রহঃ), প্রমুখ ইমামগণ এজন্য দায়ী ছিলেন না। বরং তারা সকলেই তাদের অনুসারীদেরকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে বলে গেছেন (শা'বানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)। ফের্কা বন্দির পরিণতি খুবই মারাত্মক। এক্ষেত্রে মহানবী (ছাঃ) বলেন, বানী ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে এদের একটি ব্যতীত সকল ফের্কা জাহান্নামে যাবে। নবী (ছাঃ) কে সকলে জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত সেই দলটি কারা? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবাগণ যে আদর্শে রয়েছি ঠিক সেই আদর্শের অনুসারী হবে যারা (তিরমিযী মেশকাত পৃঃ ৩০)।

প্রশ্ন-৬(৩৯)ঃ সাধারণভাবে জানি যে, চাঁদ দেখে ছওম রাখতে হয় ও চাঁদ দেখেই ঈদ করতে হয়। ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে নিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে, ৮/১০ মাইলের মধ্যে চাঁদ দেখার কোন খবর না পেলেও এবং ৩০ দিন পূর্ণ না হলেও রেডিও'র সংবাদ অনুযায়ী ছওম রাখা হয় ও ঈদ পালন করা হয়। ইহা কি কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে ঠিক? প্রমাণসহ উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল ওয়াজেদ
পাঁচ পটল
টাংগাইল।

উত্তরঃ চাঁদ দেখে ছওম রাখতে হবে ও চাঁদ দেখেই ছওম রাখা সমাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ ঈদ করতে হবে। ২৯ তারিখে চাঁদ না দেখা গেলে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে নিতে হবে। এই বিধানটি ছহীহ হাদীছভিত্তিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রতি ব্যক্তি গ্রাম কিংবা প্রতিটি থানা ও জেলার লোককে চাঁদ দেখতেই হবে। বরং কোন দূরবর্তী এলাকার বিশ্বস্ত লোক চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে সেই সংবাদে ছওম রাখা এবং ছওম ত্যাগ করা অর্থাৎ ঈদ করা যাবে। এর প্রমাণে ছহীহ সূত্র থেকে একটি হাদীছ পাওয়া যায় যে, 'একদা কিছু লোক ছওয়ারীতে চড়ে অন্য কোন দূরবর্তী স্থান থেকে নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে সংবাদ দেয় যে তারা গতকাল ঈদের চাঁদ দেখেছে। এই খবর শুনে নবী (ছাঃ) ছাহাবাগণকে ছওম ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন ও পরের দিন ঈদগাহে সমবেত হ'তে বলেন' (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজা, ইবুন হিব্বান/ নায়নুল আওতার 'কিতাবুছ ছাওম' ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৮৮)। উক্ত হাদীছে ঘটনাটি কোন নিকটতম অর্থাৎ ১০/১৫ মাইল দূরত্বের ঘটনা ছিলনা। কেননা এরূপ দূরত্বের ঘটনা হ'লে নবী (ছাঃ)-এর নিকট অবশ্যই সংবাদ পৌঁছে যেত এবং তিনি যথাসময়ে সে দিনেই ঈদ করতে পারতেন। আর যদি ঘটনাটি এরূপ নিকটতম দূরত্বের বলে ধরেও নেওয়া যায় তবুও ১০/১৫ মাইলের সীমা নির্ধারণ করেন নাই। কুরাইব হ'তে বর্ণিত হাদীছে শাম দেশে চাঁদ উদয়ের খবর মাদীনাবাসীর জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার পক্ষে ইবনু আব্বাসের যে উক্তি রয়েছে তা থেকে খুব বেশী এতটুকু নেওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা স্থানের ও চাঁদ দেখার খবর গ্রহণের স্থানের মাত্‌লা বা চাঁদ উদয় (স্থল) এক হওয়া চাই। এর অধিক নয় যেমনটি 'মির'আতুল মাফাতীহ' প্রণেতা ওবাইদুল্লাহ মুবরাকপুরী বর্ণনা দিয়েছেন। চাঁদ উদয় স্থান থেকে পূর্বে ৫৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরুত্বের লোক সেই খবরে ছওম রাখতে ও ঈদ করতে পারবে। কিন্তু চাঁদ উদয় স্থান থেকে পশ্চিমের দূরত্বে কোন সীমা নেই। এক্ষণে যদি নিখুঁত ও নির্ভূলভাবে চাঁদ দেখে রেডিও টিভিতে সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে, তবে তা গ্রহণ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন আপত্তি নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন-৭(৪০)ঃ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই আমি একটি ব্যবসা আরম্ভ করলাম। কিন্তু সমস্যা হ'ল এই যে, ব্যবসার অধিকাংশ মালের গায়েই প্রাণীর ছবিসহ লেবেল লাগানো থাকছে। এমতাবস্থায় সেই ছবিসহ সেই মালের ব্যবসা করা যায় কি-না?

আবুল কালাম আযাদ
সাং চককাযী যিয়া
পোঃ মুহাম্মদপুর
রাজশাহী

উত্তরঃ যে কোন প্রাণীর ছবি তোলা, ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা অথবা এমনভাবে ছবি ব্যবহার করা, যাতে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, শারঈ দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তা হারাম। কিন্তু আগে থেকেই অন্য কারো দ্বারা ছবি অঙ্কিত অথবা ছবি লাগোনো দ্রব্যবস্তু ব্যবহার করা কিংবা সেই দ্রব্য কেনা-বেচা করা জায়েয যদি না সেখানে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য থাকে অথবা এমন কিছু না করে যাতে ছবির সম্মান হয়ে যায়। এর দলীল স্বরূপ নিম্নে ছহীহ হাদীছ প্রদত্ত হলঃ

হযরত মায়মুন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, ফিরিস্তা এমন বাড়ীতে প্রবেশ করেন না যে বাড়িতে কুকুর কিম্বা ছবি থাকে (বুখারী, মুসলিম)।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিরা যারা ছবি তোলে (বুখারী, মুসলিম)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি তার ছোট্ট ঘরে একখানি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলেন যাতে ছবি ছিল কিন্তু নবী (ছাঃ) তা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন অতঃপর আমি তাকে দু'টি বসবার কাপ স্বরুপ বাড়িতে রেখে দিলাম, নবী (ছাঃ) তার উপর বসতেন (বুখারী-মুসলিম)। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলেন যাতে ছবি ছিল। নবী (ছাঃ) বাড়িতে প্রবেশ করলে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাকে কেটে দু'টি বালিশ করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন (বুখারী, নায়ল ২য় খন্ড পৃঃ ১০৩)।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ছবি অঙ্কিত বস্তু এমনভাবে ব্যবহার করা জায়েয প্রমাণিত হয় যাতে ছবির সম্মান না হয়ে অপমান হয়। অতএব ছহীহ হাদীছের আলোকে দোকানে ছবি টাঙ্গানো যাবে না। মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা যাবে না। তবে ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে যদি মাল ক্রয় বিক্রয়ের সাথে ছবি ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য না হয় এবং এমন মাল ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকতে হবে, যে মালের ক্রয়-বিক্রয় ছবির উপর নির্ভরশীল।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে ছবি বুঝাতে প্রাণীর ছবি। গাছ-পালা অর্থাৎ জড়বস্তুর ছবিতে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্ন-৮(৪১)ঃ ছালাত আদায়ের সময় ছালাতে সূরাগুলি কি কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ করতে হবে না এর ব্যতিক্রম করেও পড়া যায়? সূরা পাঠ করার মাধ্যমে যদি সূরা ভুলে যায় কিংবা ভুলের আশংকা থাকে তবে সেই স্থানে সূরা ইখলাছ পড়ার কি বিধান রয়েছে? দলীলসহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আবুল কালাম আজাদ
সাং- চককাযীমিয়া
পোঃ মুহাম্মাদ পুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে সূরা পাঠের নিয়ম যেহেতু প্রথম রাক'আতে কিরাআত লম্বা করা ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআত কিছুটা খাট করা, আর কুরআনে যেহেতু প্রথমে সর্বাধিক বড় সূরা (সূরা ফাতিহা ব্যতীত) তারপর ধারাবাহিকভাবে একের তুলনায় এক ছোট সূরাগুলো সাজানো রয়েছে (সামান্য ব্যতীক্রম বাদে) তাই স্বাভাবিকভাবেই কিরাআত পাঠের নিয়ম অনুযায়ী ছালাতে সূরা পাঠে কুরআনের বিন্যাস এসেই যায় এবং কুরআনের বিন্যাস অনুসারে নবী (ছাঃ)-এর ছালাতে সূরা পাঠ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কুরআনের বিন্যাস অনুসারেই ছালাতে সূরা পাঠ অপরিহার্য। বরং আগের রাক'আতে পরের সূরা পড়ে ও পরের রাক'আতে আগের কোন সূরা পড়ে বিন্যাসের ব্যতিক্রম করা জায়েয। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য যতটুকু কুরআন পাঠ করা সহজ ততটুকু পাঠ কর' (সূরা মুযাম্মেল ২০)। সুতরাং যে কোন সূরা থেকে সুবিধা মোতাবেক কুরআন পাঠ করে ছালাত আদায় করা যায়। অপরদিকে কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী নবী (ছাঃ) ছালাতে সূরা পাঠের নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাছাড়া ছাহাবী ও তাবেঈগণের বিন্যাসের ব্যতিক্রম করে ছালাতে সূরা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- তাবেঈ আহনাফ বিন কায়স (বিন্যাসের ব্যতিক্রম করে) প্রথম রাক'আতে সূরা কাহাফ ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইউসুফ কিংবা ইউনুস পড়েন আর বলেন যে, তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে ফজরের ছালাতে (এভাবেই) এ দু'টি সূরা পাঠ করেছিলেন (বুখারী ১ম খন্ড পৃঃ ১০৭)। এছাড়া প্রতি রাক'আতে (সূরা ফাতিহা ব্যতীত) অন্য সুরার সাথে সূরা ইখলাছ মিলিয়ে পড়া সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়েতো রয়েছেই। যা দ্বারা বিন্যাসের ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয় (বুখারী ১ম খন্ড ১০৭ পৃঃ)।

ছালাতে সূরা পাঠ করার মধ্যে সূরা ভুলে গেলে কিংবা ভুল হওয়ার আশংকা থাকলেও সেস্থানে নির্দিষ্টভাবে সূরা ইখলাছ পাঠ করার কোন শারঈ বিধান নেই। তাই বিধান মনে করে পাঠ করা উচিৎ নয়। কিরাআত যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকলে সে অবস্থায় সে রুকুতে চলে যাবে নচেৎ সুবিধামত যে কোন সূরা পাঠ করে কিরাআত পূর্ণ করবে অতঃপর রুকুতে যাবে।

প্রশ্ন-৯(৪২)ঃ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কি? বর্তমানে আমাদের দেশে তারাবীহ'র ছালাত এশা ছালাতের পরপরই পড়া হয়ে থাকে। এটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

ইমামুদ্দিন
নাচোল, নবাবগঞ্জ

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ ছালাতে তারাবীহ হচ্ছে মাহে রামাযানের রাতের সেই নফল ছালাত যাকে হাদীছের পরিভাষায় ছালাতুল লায়ল ও কিয়ামে রামাযান বলা হয়। অর্থাৎ অন্য ১১ মাসে রাতের যেই ছালাতকে '' তাহাজ্জুদ" বলা হয় মাহে রামাযানে সেই ছালাতকেই তারাবীহ বলা হয়। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কোন পৃথক দু'টি ছালাত নয়। মহানবী (ছাঃ) মাহে রামাযানে পৃথক পৃথকভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে কোন প্রকার হাদীছ নেই (নায়লুল আওতার ২য় খন্ড ২৯৫ পৃঃ মির'আতুল মাফাতীহ ২য় খন্ড ২২৪ পৃঃ)।

প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, মাহে রামাযানে লোকেরা রাতের এই ছালাত পড়ার সময় প্রতি চার রাক'আতের পর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন তাই এই ছালাতের নাম তারাবীহ হয়ে যায়।

ছালাতে তারাবীহ পড়ার সময় সম্পর্কে এতটুকু নিশ্চিত যে, এটি রাতের ছালাত এবং ইহা 'ছালাতে এশা'-এর পরে ও ছুবহ ছাদিক হওয়ার পূর্বের মধ্যবর্তী সময়। কারণ ছালাতে এশা -এর পূর্বে কিংবা ছুবহ ছাদিকের পরে নবী (ছাঃ) -এর যুগে কেউ এই ছালাত পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বাকী রইল ছালাতে এশা-এর পরে ও ছুবহ ছাদিকের পূর্বের মধ্যবর্তী কোন সময়ে এই ছালাত আদায়ের নির্ধারিত সময়? এ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই পূর্ণ ও দীর্ঘ সময়খানি সম্পূর্ণই 'ছালাতে তারাবীহ -এর সময়। তবে অর্ধেক রাতেই এই ছালাত পড়া উত্তম। কেননা সর্বাধিক ছহীহ সনদ সূত্রে এই ছালাত নবী (ছাঃ)-এর অর্ধেক রাতেই পড়া প্রমাণিত। যেমনটি বুখারী ১ম খন্ড ২৬৯ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর হাদীছ প্রমাণ করে। তবে অন্য হাদীছ দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, নবী (ছাঃ) এই ছালাত ছালাতে এশা এর অল্পক্ষণ পরেও পড়েছেন। যেমনটি মুসনাদে আহমাদ ৫ম খন্ড ৭-৮ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ প্রমান করে। এমনিতেই সেসময় ছালাতে এশা শেষ ও অর্ধেক রাত্রির শুরুর মধ্যে ব্যবধান খুব সমান্যই থাকত। এছাড়া নবী (ছাঃ) এই ছালাত আদায়ের জন্য রাতের কোন একটি সময়কে নিদিষ্ট করে দেননি। ফলে মুছল্লীদের সুবিধার্থে 'ছালাতে এশা' এর পর পরই এই ছালাত আদায় করে নেওয়া যায়। তবে কেউ যদি অর্ধেক রাত্রে পড়তে চায় তবে তা আরো ভালো।

প্রশ্ন-১০(৪৩)ঃ তাবীজ লটকানো জায়েয আছে কি? কোন কোন মাওলানা বলেন যে, কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয। কথাটি কি ঠিক?

কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিবেন।

আরীফুর রহমান
গ্রামঃ চরকুড়া
পোঃ বি, জামতৈল
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীয করা যদিও কতিপয় পন্ডিত জায়েয বলেছেন কিন্তু জায়েয হওয়ার পক্ষে তাদের নিকট তেমন কোন দলীল নেই কিছু অনুমান ছাড়া। 'আর আমি কুরআনে এমন বিষয়ও নাযিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা ও মুমিনদের জন্য রহমত' (বনী ইসরাঈল ৮৭) এই আয়াত দ্বারা তাবীয লটকানো প্রমাণ করে থাকে। কিন্ত এটি তাদের অনুমান মাত্র যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। বরং কুরআন তিলাওয়াত ও আয়াত দ্বারা ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে কুরআন থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা ছহীহ হাদীছ সম্মত। এছাড়া হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বায়হাক্বীর একটি হাদীছ থেকে তাবীয লটকানো প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেখানে এমন কোন কথা উল্লেখ নাই যা দ্বারা স্পষ্টভাবে তাবীয লটকানো প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্বরের ব্যক্তিগত আমল সংক্রান্ত একটি হাদীছ তাবীয লটকানোর পক্ষে পেশ করা হয় কিন্তু প্রথমতঃ সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, এটি তিনি কেবল সেই শিশুদের জন্য করতেন যারা এখনো কথা বলতে শেখেনি। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি গ্রহনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে এর বিপক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা সকল প্রকার তাবীয লটকানো নিষিদ্ধ ও শিরক প্রমাণিত হয়। যেমন- 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না আর যে ব্যক্তি কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না।' অন্য হাদীছে রয়েছে 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' আরো রয়েছে 'ঝাড় ফুঁক, তাবীযালী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার তাবীয ব্যবহার নিঃসন্দেহে শিরক'। উল্লেখিত তিনটি হাদীছ ছহীহ এবং মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ও ইবনু মাজাতে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত তিনটি হাদীছে স্পষ্টভাবে সকল প্রকার তাবীয লটকানোকে শিরক করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে ঝাড়-ফুঁক করাকে শিরক বলা হলেও এর দ্বারা শুধু সেই সকল ঝাড়-ফুকে উদ্দেশ্য রয়েছে যেগুলোতে শিরকী শব্দ রয়েছে। যেমন- মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের ঝাড়-ফুঁক আমার নিকট পেশ কর, যতক্ষণ না তাতে শিরকী শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে কোন বাধা নেই' (মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৮৮)। শিরকমুক্ত শব্দে ঝাড়-ফুঁক করার শুধু অনুমতিই প্রদান করা হয়নি বরং প্রয়োজনে মহানবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি প্রদান করেছেন' (মুসলিম)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'বদ নজরে মহানবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দেন' (বুখারী মুসলিম)। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তাকে ঝাড়-ফুঁক কর তাকে বদনজর লেগে গিয়েছে' (বুখারী মুসলিম)। উল্লেখিত হাদীছত্রয় মিশকাত পৃঃ ৩৮৮।

অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, কুরআনের আয়াতকে তাবীয করে নয় বরং আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে তা থেকে চিকিৎসা নেওয়া বিধি সম্মত।

http://islaminonesite.wordpress.com